রচনা-সার

বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ্, কার্য্য, গুণ ও ক্রিয়া

প্রভৃতি

নানাবিষয়ক রচনা সংগ্রহ

ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের নিমিত্ত

প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক

শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

স ম্য ক্ প রি শো ধি ত

ষষ্ঠ সংস্করণ।

কলিকাতা

২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন্,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য-দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯৬।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

রচনা-সার নানাবিধ পুস্তক হইতে সঙ্কলিত; ইহাতে নানা-প্রকার বিষয়ের রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ ভাগে কতকগুলি রচনার বিষয়ও লিখিত হইয়াছে। প্রথম গুণ ও ক্রিয়া বিষয়ক রচনাগুলি কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়াছে; এজন্য শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন, তাঁহারা যেন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে প্রথম পাঠনা আরম্ভ করেন; অনেকের অনুগ্রহ-দৃষ্টি হইলে দ্বিতীয়-বারে এই অসুবিধাটী অপনীত হইবে।

রচনা-সার ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থী বালকদিগের কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করণার্থই রচিত হইল। নতুবা ইহা হইতে গ্রন্থরচয়িতার যশের ভাগী হইতে বাসনা করি না। এক্ষণে যাহাদিগের জন্য ইহা অভিপ্রেত, তাহাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেই সমস্ত শ্রম সার্থক বোধ করিব।

কলিকাতা
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র
এপ্রিল, ১৮৭৪ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

রচনা-সার দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। এ বারে রচনাগুলির সন্নিবেশ-প্রণালী সম্যক্ পরিবর্ত্তিত ও গ্রন্থ যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে উদ্ভিদ্‌বিষয়ক একটীও রচনা

লিখিত হয় নাই, এ বারে সে অভাব পরিপূর্ণ করা গিয়াছে। উপক্রমণিকায় রচনা লিখিবার কয়েকটী নূতন নিয়মও সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর সুকুমারমতি বালকগণের লেখনী হইতে যেরূপ ভাষা নির্গত হওয়া সম্ভব, এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সেইরূপ কোমল ও সরল ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। কঠিন ও দুরূহ শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় নাই। বস্তুতঃ ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থী বালকগণের রচনা লিখিবার পক্ষে যাহাতে বিলক্ষণ সাহায্য হয়, তাহা করিতে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে শিক্ষক মহাশয়গণ অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের পাঠনা প্রবর্ত্তিত করিলেই সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র
২রা আগষ্ট, ১৮৭৬

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এক্ষণে প্রবেশিকা (এণ্ট্রান্স) পরীক্ষার্থীদিগকেও বাঙ্গালা রচনা লিখিতে দেওয়া হইতেছে। এই গ্রন্থখানি তাহাদিগেরও বিশেষ উপকারী হইবার সম্ভাবনা।

এবার স্থানে স্থানে দুই একটী অংশ সংশোধন করা গিয়াছে, এবং কয়েকটী নূতন রচনার বিষয়ও নিবেশিত করা হইয়াছে।

কলিকাতা
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র
১২ই মে, ১৮৮৬

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

রচনা-সার ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইল। এবারে ইহা সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে; এমন কি, ইহাকে ষষ্ঠ সংস্করণ না বলিয়া নূতন সংস্করণ বলিলেও বলা যায়। ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের জন্যই ইহা রচিত। সুতরাং ইহা যাহাতে তাহাদিগের সহজবোধ্য হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। যে যে স্থলে দীর্ঘ সমাস ও দুরূহ শব্দ সকল ছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ রচনার প্রতিপাদ্য বিষয়-গুলির ভাবের লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করিয়া রচনা লিখিবার রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। এক্ষণে পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির সভ্যগণের কৃপাবিন্দু পাইলেই সকল শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

কলিকাতা
৫১ নং, সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট।
১লা অক্টোবর, ১৮৯৬

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

নির্ঘণ্ট।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বস্তুবিষয়ক রচনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাণিবিষয়ক রচনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্ভিদ্‌বিষয়ক রচনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালবিষয়ক রচনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুণ ও ক্রিয়া বিষয়ক রচনা।

উপক্রমণিকা

রচনা লিখিবার প্রণালী।

কোন সুন্দর রচনা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়; এবং সেইরূপ রচনা লিখিতে অনেকেরই মনে অভিলাষ জন্মে। কিন্তু সুন্দর রচনা লেখা সহজ নহে। সুন্দর রচনা লিখিতে হইলে, অগ্রে প্রধান প্রধান লেখকের গ্রন্থ অধ্যয়ন, সদ্বক্তাদিগের বক্তৃতা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ, এবং স্বয়ং তাদৃশ রচনা লিখিবার অভ্যাস, করা কর্ত্তব্য। কারণ, সদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে নানা বিষয়ে জ্ঞান জন্মে; সেই জ্ঞান আবার সদ্বক্তার বক্তৃতা শ্রবণে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়; এবং বারংবার লিখিতে অভ্যাস করিলে সেই জ্ঞানবলে সুন্দর রচনা লিখিতে পারা যায়। সুন্দর বক্তৃতা করিবার শক্তি স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু সুন্দর রচনা লিখিবার ক্ষমতা অভ্যাসাধীন।

জগতে রচনার বিষয় অসীম। বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ, কাল, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি নানাবিষয়ক রচনা হইতে পারে। তন্মধ্যে কোনবিষয়ক রচনা কিপ্রকার প্রণালীতে লিখিতে হইবে,

তাহার সমস্ত নিয়ম সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। এজন্য কেবল কতকগুলি প্রধান প্রধান নিয়ম প্রদর্শিত হইতেছে।—

১ম। যে বিষয়ে রচনা লিখিতে হইবে, তদ্বিষয়ক সমস্ত ভাব অগ্রে মনে মনে স্থির করা কর্ত্তব্য।

২য়। অসার শব্দাড়ম্বর করিয়া রচনা দীর্ঘ করা উচিত নহে। সারবান্ ক্ষুদ্র রচনাও আদরণীয়।

৩য়। রচনায় সরল অথচ ভাববোধক শব্দ সকল প্রয়োগ করা বিধেয়। অপ্রচলিত বা দুর্ব্বোধ শব্দ ব্যবহার করা উচিত নহে।

৪র্থ। রচনায় যেগুলি বিশেষ আবশ্যক, সেই সমস্ত বিষয়ই লেখা উচিত। প্রয়োজন হইলে অতিসংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তও লিখিতে পারা যায়।

৫ম। এক বিষয়ের পুনরুক্তি উচিত নহে।

৬ষ্ঠ। রচনার সমুদয় ভাবগুলি পর পর সজ্জিত অথচ পরস্পর অবিরোধী হওয়া উচিত, অর্থাৎ ভাব সকল এরূপ সুচারু প্রণালীতে লিখিতে হইবে, যাহাতে পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ ঠিক থাকে অথবা বিপরীত হইয়া না পড়ে।

এইরূপ বিষয়বিশেষে আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম শিক্ষক মহাশয়গণ বালকদিগকে উপদেশ দিবেন। মনে করুন, "চৌর্য্য"-বিষয়ক একটী রচনা লিখিতে দেওয়া গেল। এ স্থলে চৌর্য্য কি পদার্থ, কি কি কার্য্য করিলে চৌর্য্য হয়, চৌর্য্য দ্বারা সমাজের কি কি অপকার জন্মে, এবং চৌর্য্যের

কিরূপ পরিণাম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ভাবগুলিই অন্তঃকরণে উদিত হয়; এবং এইগুলিই রীতিমত সাজাইয়া লিখিতে পারিলে সুন্দর রচনা হইয়া থাকে। তাহা না করিয়া যদি প্রথমেই চৌর্য্যের পরিণাম, পশ্চাৎ চৌর্য্যের লক্ষণ, অথবা চৌর্য্যের লক্ষণ সম্পূর্ণ না করিয়াই কারাগারের ক্লেশ বর্ণন করা যায়, তাহা হইলে চৌর্য্যসংক্রান্ত ভাবগুলির পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ থাকে না; সুতরাং রচনাও সুন্দর হয় না। আরও দেখুন, "গাভী"-বিষয়ক রচনা লিখিতে হইলে, গাভী কোন্‌জাতীয় পশু, ইহার কিরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি, কোন্ কোন্ দেশ ইহার জন্মস্থান, এবং ইহা হইতে আমাদিগের কি কি উপকার হয়, ইত্যাদি ভাব সকলই লেখা উচিত। কিন্তু তাহা না করিয়া, গরুর দুগ্ধে আমাদিগের রসনার তৃপ্তিকর যে সকল মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তৎসমুদায় বর্ণন করিলে, যথার্থ গাভী-বিষয়ক রচনা লিখিত হইবে না। ঐগুলি দুগ্ধবিষয়ক প্রবন্ধেরই উপযুক্ত। নারিকেল প্রভৃতি "বৃক্ষ"বিষয়ক রচনায়, উহাদিগের আকার, প্রকার, যে যে দেশে উহারা অধিক-সংখ্যক জন্মে, এবং আমাদের যে যে উপকারে আসে, তৎ-সমুদায় লেখা কর্ত্তব্য। "নগর" অথবা কোন "দেশ" বর্ণন করিতে হইলে, তাহার প্রাকৃতিক আকৃতি, অধিবাসীর সংখ্যা, তথাকার বাণিজ্য ব্যবসায়, তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস এবং সেই সময়ের অবস্থা বর্ণন করিতে হয়। ইত্যাদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বস্তুবিষয়ক রচনা।

১ম—কাগজ।

সকল দেশের মনুষ্যই আদিম অবস্থায় লেখাপড়ার নামমাত্রও জানিত না। পরে সভ্যতার আরম্ভের সময় বর্ণমালার সৃষ্টি হইলে, লোকে স্বকীয় মনোগত ভাব বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদিগের মসী, লেখনী ও লিখনাধারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জগতে লিখনাধারের অভাব ছিল না। লোকে প্রথমে বট, অশ্বত্থ, কদলী, তাল প্রভৃতি বৃক্ষগুলির পত্রেই লিখিতে লাগিল। ঐ সকলের মধ্যে তালপত্র দীর্ঘকালস্থায়ী ও সুদৃঢ় বলিয়া ভারতবর্ষে অধিক ব্যবহৃত হইত। অদ্যাপি আমাদিগের দেশীয় পাঠশালার বালকেরা এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশবাসিগণ ঐ পত্রের মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সর্ব্বাগ্রে পত্রেই লেখা চলিত বলিয়া অদ্যাপি 'পত্র' শব্দ কাগজেও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। * বৃক্ষপত্রের পর বৃক্ষবল্কলে লেখা চলিতে লাগিল; তন্মধ্যে আমাদিগের দেশে

* ইংরেজী leaf শব্দ এবং ল্যাটিন্ folium শব্দ বলিলে বৃক্ষপত্র ও পুস্তকের পত্র উভয়ই বুঝায়।

ভূর্জত্বক্‌ই অধিক ব্যবহৃত হইত। সময়ে সময়ে ধাতুময় ও প্রস্তরময় ফলকেও * লিখনকার্য্য নিষ্পন্ন হইত, এবং এক্ষণেও হইতেছে।

ঠিক কোন্ সময়ে আমাদিগের দেশে কাগজ প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা কিছুই স্থির করা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীন দেশে কাগজ আবিষ্কৃত হয়, এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে আসে। † বস্তুতঃ আমাদিগের দেশে চীনের কাগজ ও তুলট এই দুইপ্রকার লেখ্য সামগ্রী বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। পরে যখন ইয়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে কাগজ আসিতে লাগিল এবং এদেশেও উহা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল, ‡ তখন এখানে চীনের কাগজ ও তুলটের আদর কমিয়া আসিল। এক্ষণে দেশীয় কাগজ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হওয়াতে, বিলাতী কাগজেরও আমদানী অনেক কমিয়া গিয়াছে।

জগতের মহোপকারক এই দ্রব্য প্রস্তুত করিবার বিদেশীয় প্রণালী বোধ হয় অনেকে জানেন না। কেহ কেহ বাঙ্গালা কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখিয়াও থাকিবেন। ছিন্ন

* নানাদেশীয় অনুশাসন-পত্র এবং কীর্ত্তিস্তম্ভাদিতে খোদিত ফলকাদি।

† কাগজ শব্দটী পারস্যভাষার কথা; ইহাতে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুসলমানেরাই উহা এদেশে প্রথম আনয়ন করেন; কিন্তু কোন্ স্থান হইতে আনেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

‡ পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুত হইত; এক্ষণে বালী ও টিটেগড়ে হইতেছে।

বস্ত্র, পাট, শণ, খড় প্রভৃতি বস্তুই কাগজের প্রধান উপকরণ। ছিন্নবস্ত্রগুলি প্রথমে উত্তমরূপে কাচিয়া, পরে ঢেঁকিতে কুটে; এবং ঐ কুট্টিত পদার্থ জল দিয়া মাখিয়া মণ্ডের ন্যায় করে। ঐ মণ্ড আবার ঈষদুষ্ণ জলে গুলিলে একপ্রকার দ্রব দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পরে বংশ বা লৌহ শলাকাময় একটী ছাঁকনি ঐ জলে ডুবাইয়া কিয়ৎক্ষণ ঊর্দ্ধে ধরিয়া থাকিলে, ঐ দ্রবীভূত মণ্ড উহার উপরিভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং ঐ ছাঁকনির ছিদ্র দিয়া জলভাগ নির্গত হইয়া যায়। তখন উহা কোন তক্তার উপরে উল্টিয়া ঝাড়িলে, ছাঁকনির আকারের ন্যায় কাগজ প্রস্তুত হয়। এইরূপে উপর্য্যুপরি অনেক কাগজ রাখিয়া পরে ঐ রাশির উপর কোন চাপ দিলে, অবশিষ্ট জলভাগ নির্গত হইয়া যায়। পরে ঐ কাগজগুলি পৃথক্ পৃথক্ শুকাইয়া, ভাত, আলু অথবা অন্য কোন দ্রব্যের মাড় দিয়া, পুনঃ শুকাইলে উহা শক্ত হইয়া আসে। অনন্তর ঐগুলির চারি ধার সমান করিয়া কাটিয়া দিস্তা বাঁধিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করে।

এদেশে উপরি-উক্ত কার্য্যগুলি হস্ত দ্বারা সম্পন্ন হয়; কিন্তু ইয়ুরোপ বা আমেরিকায় তাবৎ কার্য্যই কলে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এজন্য তথাকার কাগজ অতি উৎকৃষ্ট ও অতি অল্পকালের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ইয়ুরোপ-জাত কাগজের মধ্যে ব্রিটন ও ফ্রান্স দেশেরই কাগজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কাগজ নানা আকারের ও নানা বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগী কাগজের আকার একপ্রকার এবং আফিসে যে সকল কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহাদিগের আকার অন্যপ্রকার। আফিসের কাগজকে

প্রায়ই ফূল্‌স্ক্যাপ্‌ কহে। অনেক পুস্তকের উপরিভাগে নানা বর্ণের কাগজ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অতি সহজ। জলে মণ্ড গুলিবার সময় তাহাতে যে রঙ্‌ মিশ্রিত করা যায়, কাগজও সেই রঙ্গের হয়। বিলাতীয় কাগজের ২৪ তায় ১ দিস্তা, এবং ২০ দিস্তায় ১ রীম হয়। কিন্তু জর্ম্মন ও দেশীয় কাগজের ২৫ তায় ১ দিস্তা, এইমাত্র প্রভেদ। মুদ্রাযন্ত্রের সুবিধার্থ এক্ষণে অনেক বিলাতীয় কাগজেরও ২৫ তা করিয়া দিস্তা করা হইয়াছে।

তেঁতুলের বীজের সারাংশ মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে এবং কখন পীত, কখন বা পীতলোহিত বর্ণ মিশাইলে, তুলট কাগজ প্রস্তুত হয়। কীটে কাটিবার ভয়ে ঐ কাগজে কিঞ্চিৎপরিমাণে সেঁকো বিষ বা হরিতাল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

বৃক্ষত্বকের ন্যায় পশুচর্ম্মও আমাদিগের লেখাকার্য্য সম্পন্ন করে। মেষ বা ছাগের পরিষ্কৃত চর্ম্মে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়; উহা বহুকালস্থায়ী ও অত্যন্ত শক্ত। উহাকে ইংরেজিতে পার্চমেণ্ট কহিয়া থাকে। মানবের কি বুদ্ধি-কৌশল! সামান্য পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে চর্ম্মকেও লিখন-সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে।

২য়—কাচ।

কাচ আমাদিগের দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বালী ও একপ্রকার ক্ষার একত্র করিয়া অত্যন্ত অগ্নির উত্তাপে গলাইলে কাচ প্রস্তুত হয়। ইহা আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে। ইহাতে আরসি, সারসি, শিসি, বোতল, গেলাস, বাটী, রেকাব, ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতি অনেকপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। ইহা দ্বারা চসমাও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাচের অনেক গুণ। ইহা অতি স্বচ্ছ পদার্থ। কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতির ভিতর দিয়া যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, কাচ সেরূপ নহে; ইহার মধ্য দিয়া আলোক আসিতে পারে, সুতরাং ইহার আবরণেও আমরা দেখিতে পাই। কাঁসা, পিতল প্রভৃতি দ্রব্যে যেরূপ কলঙ্ক পড়ে, কাচে সেরূপ পড়ে না, ইহা সর্ব্বদাই মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে। এইজন্য সভ্যজাতির মধ্যে অনেকেই কাচ-পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাচের একটী মহৎ দোষ থাকাতেই কাচ-পাত্র সকলে ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা অতি ভঙ্গপ্রবণ অর্থাৎ অতি অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। একবার ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগে না। * এরূপ ভঙ্গপ্রবণ না হইলে, সকলেই কাচদ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিত।

কাচ অপরিচালক। একখানি কাচখণ্ডের এক ধার ধরিয়া

* সম্প্রতি কাচ জুড়িবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে জোড়া অধিক দিন থাকে না।

অন্য ধারে অগ্নির শিখা লাগাইলে, যে ধার ধরিয়া থাকা যায়, সে ধার উত্তপ্ত হয় না; কেবল যে ধারে অগ্নিশিখা লাগে, সেই ধারই গরম হইয়া উঠে। তাপ এক ধার হইতে অন্য ধারে চলিতে পারে না বলিয়াই কাচের ঐরূপ নাম হইয়াছে।

কাচ এত ভঙ্গুর বটে, তথাপি হীরক ব্যতীত আর কিছুতেই ইচ্ছামত কাটিতে পারা যায় না। হীরকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর টানিয়া গেলে দাগ পড়ে, পরে দুই ধারে জোর দিলেই ঐ দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়।

কাচ হইতে আমাদিগের আরসি প্রস্তুত হয়। পারা ও রাঙ্ এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কাচের পৃষ্ঠে লেপিয়া দিলে উহাতে সকল বস্তুরই স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ে। যত দিন ঐ লেপ ঠিক থাকে, তত দিন উহাতে মুখ প্রভৃতি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আর যখন ঐ লেপ উঠিয়া যায়, তখন ঐ কাচে আর ভালরূপ প্রতিবিম্ব পড়ে না।

আমরা নানাবর্ণের কাচ দেখিতে পাই। অগ্নির উত্তাপে কাচ যখন দ্রবীভূত হইয়া যায়, সেই অবস্থায় যে বর্ণ ইচ্ছা সেই বর্ণ মিশ্রিত করিলে কাচও সেই বর্ণের হয়। গলিত অবস্থায় কাচ ইচ্ছামত আকারে ঢালিতে পারা যায়, পরে শীতল হইলে কঠিন হইয়া উঠে। এইরূপ গলাইয়া লোকে কাচের বাসন, ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

৩য়—কর্পূর।

ভারতবর্ষ ও আরবদেশে বহুকালাবধি কর্পূর প্রচলিত আছে। কিন্তু উহা ঐ দুই স্থানেই জন্মে না; প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো ও জাপান নামক দ্বীপে এবং চীন দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে একপ্রকার প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মে; কর্পূর তাহারই অন্তর্গত আটা। আমাদিগের দেশে জিউলী, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে যেরূপ আটা বহির্গত হয়, কর্পূরের প্রাচীন বৃক্ষত্বক্ হইতেও ঐরূপ তৈলের ন্যায় পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। ঐ পদার্থ ছুরিকাদি দ্বারা চাঁচিয়া লইলে কর্পূর প্রস্তুত হয়।

আমরা সচরাচর যে কর্পূর ব্যবহার করি, তাহা জাপানদেশীয়। তথায় জাপানীয়েরা কেবল বৃক্ষত্বকের আটা লইয়াই ক্ষান্ত থাকে না। কর্পূরবৃক্ষের মূল, স্কন্ধ প্রভৃতি সমুদয় অঙ্গ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া একটী লৌহপাত্রে স্থাপিত করে। পাত্রটীর মুখ সরু ও তলদেশ প্রশস্ত। পাত্রে কিঞ্চিৎ জল ও ঐ বৃক্ষখণ্ডগুলি রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া অত্যন্ত অগ্নির উত্তাপ দেয়। অগ্নিতাপে কর্পূর বৃক্ষখণ্ড হইতে বাষ্পাকারে উড়িয়া লৌহপাত্রের মুখে লাগে এবং ঐ স্থানে জমাট বাঁধে। এই কর্পূর মধ্যবিধ। কিন্তু চীনদেশীয় লোকেরা যাহা ব্যবহার করে, তাহা সাতিশয় উৎকৃষ্ট এবং বহুমূল্য। তাহাকে হিমসিম কর্পূর কহে।

কর্পূর দেখিতে শুভ্রবর্ণ ও উজ্জ্বল। ইহা অনেক দ্রব্য অপেক্ষা লঘু। বাতাস লাগিলে কর্পূর উবিয়া যায়, অর্থাৎ

ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু বায়ুর সহিত উড়িয়া যায়। এই-জন্য কর্পূর সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কর্পূর উবিয়া: যায় বলিয়া লোকে ইহার সহিত গোলমরিচ মিশ্রিত করিয়া রাখে, কিন্তু তাহা কতদূর ফলদায়ক তাহা বলা যায় না।

কর্পূর একপ্রকার তৈলবৎ পদার্থ। ইহাতে তৈলের অনেক গুণ আছে। ইহা জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, তৈলবৎ জলের উপরি ভাসিয়া থাকে। কেবল তৈল ও সুরায় গলিয়া যায়। কর্পূর উত্তম জ্বলিয়া থাকে, এবং জ্বলন্ত কর্পূর জলে ফেলিয়া দিলেও নির্ব্বাণ হয় না। কর্পূর আমাদিগের দেশে তৈলের সহিত মাতায় মাখিয়া থাকে; তাহাতে মাতায় উকুন হইতে পারে না। কর্পূরের গন্ধে কোন কীট থাকিতে পারে না; এজন্য কর্পূরের তৈল বস্ত্রাদিতে মাখিয়া রাখিলে, উহা কীটে কাটিতে পারে না।

কর্পূর আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে। ইহাতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর, এজন্য আমরা পানীয় জল ও তাম্বূলাদিতে ব্যবহার করি। অজীর্ণ রোগে অল্পপরিমাণে কর্পূর খাইলে উপকার হয়। কর্পূর ওলাউঠা রোগের একটী প্রধান ঔষধ। কর্পূরে অনেক দুর্গন্ধ নিবারিত হয়; এজন্য দেশে ওলাউঠা রোগ প্রবল হইলে, চিকিৎসকেরা সর্ব্বদা কর্পূরের আঘ্রাণ লইতে বিধি দেন।

৪র্থ—গন্ধক।

যে সকল বস্তু আকর বা খনি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে খনিজ বস্তু বলা যায়। গন্ধক একটী খনিজ পদার্থ। আসিয়ার মধ্যে নেপাল, পারস্য, জাবা প্রভৃতি দেশের আকর হইতে অনেক গন্ধক উত্তোলিত হইয়া থাকে। ইয়ুরোপে সিসিলী ও আইস্‌লণ্ড দ্বীপে যথেষ্ট গন্ধক পাওয়া যায়। যখন খনি হইতে তোলা হয়, তখন গন্ধক বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই-প্রকারই দেখা যায়। কিন্তু আগ্নেয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি স্থান সকলে প্রায়ই বিশুদ্ধ গন্ধক পাওয়া যায়; ইহাতে অনেকে অনুমান করেন, আগ্নেয় গিরির অগ্নিতাপে তৎপ্রদেশীয় গন্ধক-রাশি বিশুদ্ধ হইয়া যায়। বিমিশ্র অবস্থায় গন্ধকে সীস, দস্তা, তাম্র, হরিতাল প্রভৃতি অনেকানেক বস্তু মিশ্রিত থাকে। উপযুক্ত অগ্নির উত্তাপে ঐ বিমিশ্র দ্রব্যও বিশুদ্ধ হইয়া আসে। গন্ধক খনিজ অবস্থায় জল অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক দুই গুণ ভারি।

গন্ধক দেখিতে পীতবর্ণ, কঠিন এবং ভঙ্গপ্রবণ। ইহা অল্প অগ্নির উত্তাপে গলিয়া যায়। কিন্তু উত্তাপ যত অধিক দেওয়া যায়, গন্ধকের বর্ণ ক্রমশঃ ততই কৃষ্ণ হইতে থাকে; ক্রমে চটা গুড়ের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। আরও উত্তাপ দিলে ইহা পুনরায় আরক্ত-কৃষ্ণ তরল পদার্থ হইয়া পড়ে। তখন ইহা ফুটিতে থাকে, এবং ইহা হইতে একপ্রকার আরক্তিম বাষ্প উত্থিত হয়।

গন্ধক জল বা অন্য কোন তরল পদার্থে গুলিতে পারা যায় না; উষ্ণ গর্জ্জন তৈল বা তার্পিন তৈলে ফেলিলে গলিয়া যায়।

গন্ধক অনেক উপকারে লাগে। গন্ধকে দেশলাই প্রস্তুত করা আমাদিগের দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। গন্ধকে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়। গন্ধক হইতে একপ্রকার দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া ইংরেজেরা রসায়ন-বিদ্যার অনেক উন্নতি করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষায় এই দ্রাবককে "সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্" কহে; ইহা অতিশয় উগ্র ও অম্ল। ইহা বস্ত্রাদিতে লাগিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা পুড়িয়া যায়। এই দ্রাবক সমস্ত ইংলণ্ডে প্রতিমাসে প্রায় ২৪০০০০০ মণ, এবং আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে প্রায় ৮০০০০০ মণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে গন্ধকদ্রাবক যে কত উপকারী, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

আমরা যে তুঁতে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা গন্ধকদ্রাবক ও তাম্র এই উভয় একত্র করিয়া অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিলেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। গন্ধকদ্রাবকে লৌহ মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপ দিলে, হীরাকস প্রস্তুত হয়। গন্ধক বারুদের একটী উপকরণ।

৫ম—বারুদ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদিগের দেশে ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করা প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি বনবাসী অসভ্যদিগের মধ্যেও ঐ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দিন জগতে

বারুদের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন অবধি যুদ্ধ-প্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। এককালে সহস্র সহস্র জীবের প্রাণসংহার করিবার উপায় * পূর্ব্বে ছিল না; এক্ষণে বারুদ আবিষ্কৃত হওয়াতে তৎসঙ্গে-সঙ্গে কামান, বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি সর্ব্বনাশ-কর নানা সামগ্রীরও সৃষ্টি হইয়াছে। বারুদের এত বল যে, ইহা দ্বারা দুর্ভেদ্য দুর্গ অথবা সুদৃঢ় পর্ব্বতদেশও ভগ্ন করিতে পারা যায়।

বারুদ কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ, চূর্ণ দ্রব্য। বারুদ প্রস্তুত করিতে তিনটী দ্রব্যের প্রয়োজন; সোরা, গন্ধক ও অঙ্গার। এক শত ভরি বারুদ প্রস্তুত করিতে হইলে ৭৫ ভরি সোরা, ১০ ভরি গন্ধক ও ১৫ ভরি অঙ্গার লাগে। † প্রথমতঃ ঐ তিন দ্রব্যকে পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া জল দিয়া একত্র মিশ্রিত করিতে হয়; পরে ঐ মণ্ড উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া চালনী দ্বারা চালিয়া লইলে বারুদ প্রস্তুত হয়।

অতি অল্পপরিমাণ বারুদে অগ্নি দিলে বৃহদাকার গোলা কামান হইতে বহির্গত হইয়া বহু দূরে গিয়া পড়ে। এরূপ হইবার কারণ এই যে, বারুদ অত্যন্ত বাষ্পজনক পদার্থ; বাষ্পেরও বিস্তৃত হইবার শক্তি অতিশয় প্রবল। অতি অল্প-

---

* প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে শতঘ্নী নামে একটী অস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দারা এক কালে শত ব্যক্তির প্রাণবধ হইত বলিয়া লিখিত আছে।

† উপরি উক্ত প্রণালীতে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া বাসীরা বারুদ প্রস্তুত করেন। কিন্তু ফ্রান্স, প্রসিয়া ও চীন দেশে ঐ সকলের পরিমাণের কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে।

পরিসর পাত্রে কিঞ্চিৎ বারুদ রাখিয়া তাহাতে অগ্নি দিলে, ঐ বারুদে যে বাষ্প জন্মে, তাহা ঐ ক্ষুদ্র পাত্রে কখন ধরে না। যদি ঐ পাত্রে কোন ছিদ্র থাকে, তবে সেই ছিদ্র দিয়া ঐ বাষ্প প্রবলবেগে বহির্গত হয়। আর যদি ঐ পাত্র সম্পূর্ণরূপ আবৃত থাকে, তাহা হইলে, উহা যত কঠিন হউক না কেন, বাষ্প উহা ভেদ করিয়া ভয়ানক শব্দে বহির্গত হয়।

বারুদের এই গুণ দেখিয়া আমাদিগের দেশীয় লোকেরা অনেকপ্রকার আতোষী বাজি সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যোমা, হাওয়াই, তুবড়ী, দোদমা, ছুঁচো প্রভৃতি নানাপ্রকার বাজি বারুদের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য অনুসারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আতোষী বাজিতে যে বারুদ ব্যবহৃত হয়. তাহাতে উহার উপকরণেরও ন্যূনাধিক্য আছে। কোনটীতে গন্ধকের, কোনটীতে সোরার, কোনটীতে বা অঙ্গারের ভাগ অধিক।

৬ষ্ঠ—সাগুদানা, আরোরুট প্রভৃতি।

অতি অল্প দিন হইল আমাদিগের দেশে সাগুদানার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই উপকারী বস্তু আমাদিগের জানা ছিল না। এমন কি, অনেকে ইহা বিলাত হইতে আনীত মনে করিয়া অপবিত্র বোধে স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু সাগুদানা বিলাতীয় বস্তু নহে। প্রশান্ত মহাসাগরে মলক্কস্ ও ফিলিপাইনপুঞ্জ নামক কতকগুলি দ্বীপ আছে। তথায় তাল-

জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। বৃক্ষগুলি দৈর্ঘ্যে ১৭।১৮ হাত পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া থাকে। সাগুদানা সেই সকল বৃক্ষের মজ্জা।

বৃক্ষটীকে বিনষ্ট না করিলে সাগুদানা পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহা লম্বা লম্বা চিরিতে হয়, পরে উহার মধ্যস্থিত মজ্জা বাহির করিয়া তাহা চূর্ণ করিতে হয়; অনন্তর ঐ চূর্ণগুলি উত্তমরূপে চালনী দ্বারা চালিয়া জলে গুলিয়া মণ্ডের মত করিতে হয়। ঐ মণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই সাগুদানা প্রস্তুত হয়। দ্বীপবাসীরা সাগুদানা উক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরণ করে।

সাগুদানা অতি লঘু পদার্থ। আমাদিগের দেশীয় চিকিৎসকেরা পূর্ব্বে রোগীকে খৈ পথ্য করিতে দিতেন, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে সাগুদানা ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন। সাগুদানা খাইতে বড় সুস্বাদ নহে; কিন্তু রোগীর পথ্যের উপযোগি এরূপ বস্তু আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। সাগুদানা গোলাকার ও শুভ্রবর্ণ। লঘুপাক বিবেচনা করিলে সাগুদানা মধ্যম; আরোরুট অত্যন্ত লঘু, এবং সুজি সাগুদানা অপেক্ষা গুরুপাক।

আরোরুট—একজাতীয় গুল্মের মূলভাগের পালো। ঐ গুল্ম দেখিতে আদা বা হরিদ্রা গাছের সমান। আমেরিকা ও বাঙ্গালার কোন কোন প্রদেশে এই গুল্মের চাষ হইয়া থাকে। আরোরুটের মূল সকল ভূমি হইতে তুলিয়া উত্তমরূপে জলে ধৌত করে; পরে অস্ত্র দ্বারা উহার উপরকার ছাল তুলিয়া ফেলিয়া যাঁতা বা ঢেঁকি অথবা অন্য কোন যন্ত্র দ্বারা উহা সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করে। পরে পরিষ্কৃত জলে বারংবার

ধৌত করিলে ঐ চূর্ণ হইতে শুভ্রবর্ণ একপ্রকার পালো নির্গত হয়, তাহাই শুষ্ক হইলে আরোরুট হইয়া থাকে। আরোরুট উদরাময়-রোগীদিগের উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য।

বার্লি বা যবচূর্ণ—এক্ষণে সচরাচর ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা রোগীদিগের, বিশেষতঃ বালকগণের, পক্ষে বিশেষ উপকারী।

৭ম—রেশম।

রেশম একপ্রকার কীটের লাল। ঐ লাল দ্বারা যে সূত্র প্রস্তুত হয় তাহা অত্যন্ত শক্ত, অনেক জোর দিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। এই কীটকে আমাদিগের দেশে গুটিপোকা কহিয়া থাকে। গুটিপোকার শরীর-নির্গত লাল দ্বারা আমাদিগের নানা অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তসর, গরদ, শাটিন, মখমল, কিংখাপ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র এই রেশমের দ্বারাই নির্ম্মিত। রেশম প্রায় সচরাচর পীতবর্ণই দেখিতে পাওয়া যায়, কখন বা শুক্লবর্ণও দৃষ্ট হয়। রেশম অতি কোমল ও লঘু, এবং অপরিচালক; এইজন্য শীতকালে গাত্রে জড়াইলে শরীরের তাপ বহির্গত হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশে রেশম বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্রকেই আমরা চীনাংশুক অর্থাৎ চীনদেশীয় বস্ত্র কহিয়া থাকি। প্রথমে রোমকেরা এই ভারত-বর্ষ হইতে রেশম লইয়া গিয়া ইয়ুরোপে প্রচলিত করেন।

এক্ষণে অন্যান্য ইয়ুরোপীয়েরা এ দেশ হইতে গুটিপোকা লইয়া গিয়া স্বদেশে রেশম প্রস্তুত করাইতেছেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে মুরসিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, ভাগলপুর প্রভৃতি অনেক স্থানে রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে রেশমের কুটী আছে। ঐ সকল কুটীতে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া রেশম প্রস্তুত করা হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইতেছে। কিন্তু গুটিপোকা স্বভাবতঃ বৃক্ষে যেরূপে জন্মে তাহা না জানিলে, উক্ত প্রণালী বুঝা যাইবে না, এজন্য গুটিপোকার স্বাভাবিক জন্ম অগ্রে বর্ণিত হইল।

গুটিপোকার জীবন অতি চমৎকার। ইহাদের জীবনের চারি অবস্থা—প্রথমতঃ অণ্ড, পরে কাটি, তৎপরে গুটি, এবং সর্ব্বশেষে প্রজাপতি। এক পোকাই বয়ঃক্রম-ভেদে এই চারিটী ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। কুল, জীবন, অশ্বত্থ, পলাশ, তুত প্রভৃতি অনেকপ্রকার বৃক্ষে এই পোকাগুলি অণ্ড প্রসব করে। কুটীতে যে রেশম প্রস্তুত হয়, তাহা তুত গাছেই জন্মে। কুলের গুটি পাওয়া কঠিন; উহাতে মাছ ধরিবার ছীপের কড় প্রস্তুত হয়।

বৃক্ষের পত্রে যে সকল অণ্ড প্রসূত হয়, তাহা উপযুক্ত উত্তাপ পাইয়া ফুটিয়া যায়, এবং তন্মধ্য হইতে শূয়াপোকার ন্যায় কীট সকল বহির্গত হয়। কীটগণ ঐ বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও সবল হইয়া উঠে, এবং বৃক্ষের চারি দিকে বিচরণ করিতে থাকে। এক মাসের মধ্যে উহারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহাদিগের অবয়ব প্রায় এক ইঞ্চ স্থূল ও তিন চারি ইঞ্চ দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে

উহারা অনেক বার শরীরের খোলস পরিত্যাগ করে ; তাহাতে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে উহাদিগের ক্ষুধা এত অল্প হইয়া আসে, যে, শেষে একেবারে আহারে স্পৃহাই থাকে না। এই সময়ই উহাদিগের কীটাবস্থার চরম সীমা। এখন দুই তিন দিন অনাহারে থাকিয়া তিন চারিটী পাতা একত্র করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে, এবং নাসিকা হইতে সূত্রের ন্যায় এক প্রকার লাল বাহির করিয়া ঐ পাতাগুলিতে জড়াইতে থাকে। এইরূপ পাঁচ সাত দিন ক্রমাগত সূত্র বাহির করিয়া বাসস্থানটী এরূপ আবৃত ও কঠিন করে যে, কোন পক্ষী চঞ্চু বা নখ দ্বারা উহা ভেদ করিতে পারে না। ঐ বাসস্থানের নাম কোষ অথবা গুটি ; এই অবস্থাতেই কীটগণ গুটিপোকা বলিয়া খ্যাত হয়।

গুটিপোকা আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া ঐ জালমধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। তখন আর উহারা কীট থাকে না, পতঙ্গ হইয়া উঠে। কিন্তু যত দিন ঐ বাসস্থানরূপ কারাগারে বাস করে, তত দিন তাহারা জীবিত আছে কি না, দেখিলে সন্দেহ উপস্থিত হয়। পরে বিশ পঁচিশ দিনের পর বাসস্থান ভেদ করিয়া সুন্দর পক্ষে সুশোভিত প্রজাপতি সকল বহির্গত হয়। এই অবস্থাই উহাদিগের জীবনের শেষ সীমা। এই সময়েই স্ত্রী প্রজাপতি সকল অনেক অণ্ড প্রসব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পুরুষ প্রজাপতিগুলিও ত্বরায় মরিয়া যায়। এইরূপে এই অদ্ভুত জীবেরা দুই তিন মাসের মধ্যেই চারিপ্রকার আকার পরিবর্ত্তন এবং জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ অল্প কালের মধ্যে ইহারা

আমাদিগকে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী প্রদান করিয়া যায়; উহাতে আমরা কতপ্রকার সুখকর বস্তু প্রস্তুত করিয়া উপভোগ করি।

কুটীর প্রণালী।—স্ত্রী প্রজাপতিগণ যখন অণ্ড প্রসব করিতে আরম্ভ করে, তখন কুটীর লোকেরা কৌশলক্রমে ঐ সকল অণ্ড বস্ত্রাদির উপর পাড়াইয়া ঐগুলি সংগ্রহ করে; পরে ঐ সকল অণ্ড ফুটিবার পূর্ব্বে ঐগুলি তুত-পাতা-বিছান বাজ্‌রায় স্থাপিত করে। অণ্ডগুলি ফুটিয়া তুতপাতা ভক্ষণ করত বাড়িতে থাকে; এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারে লাল দ্বারা পাতায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। কিন্তু ঐ বাসস্থান ভেদ করিয়া প্রজাপতি বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, লোকেরা ঐ গুটিগুলি উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পোকা সকল মারিয়া ফেলে। নতুবা বাসস্থান ভেদ করিয়া গুটিপোকা বাহির হইলে, সমস্ত সূত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়।

এইরূপে গুটি প্রস্তুত হইলে, লোকেরা তাহার উপরিস্থ আবরণের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, থাই বাহির করিয়া সূত্র তুলিয়া থাকে। এইরূপে রেশম প্রস্তুত হয়।

৮ম—উর্ণা।

জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই জগদীশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথি-

ধীর যে স্থানে শীতাতপের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তিনি সেই স্থানের উপযোগি বস্তু সকলও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। কি আহারীয়, কি পরিধেয়, সমস্ত বস্তুই প্রত্যেক স্থানের উপযোগি রহিয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্পাস, শিমুল প্রভৃতি লঘু পরিধেয় বস্তুর সৃষ্টি, আর হিমপ্রধান দেশে মেষ, ছাগ প্রভৃতির গাত্রে প্রচুর ঊর্ণার উৎপত্তি—এই সকলই সেই বিধাতার কৌশল।

পৃথিবীর উত্তর ভাগে অতিশয় শীত, সুতরাং তথায় শীতনিবারণের উত্তম উপায় থাকা আবশ্যক। জগদীশ্বর সেই সকল স্থানে ঊর্ণার অধিক উৎপত্তি করিয়া দিয়াছেন। মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুর গাত্রে যে লোম জন্মে, তাহার নাম ঊর্ণা। ঊর্ণার অপর নাম পশম। পশমে স্থিতিস্থাপক-গুণ আছে, অর্থাৎ ইহা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহা অত্যন্ত অপরিচালক, অর্থাৎ ইহার ভিতর হইতে তাপ সহজে বহির্গত হইতে পারে না। অপরিচালক বলিয়াই সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র অপেক্ষা পশমী বস্ত্র সকল অধিক শীত নিবারণ করিয়া থাকে। এইজন্য শীতকালে পশমী কাপড় অন্য সকল প্রকার কাপড় অপেক্ষা অধিক ব্যবহার্য্য হইয়াছে।

পশমী বস্ত্র অনেকপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়;—শাল, কম্বল, বনাত, কার্পেট, ফ্লানেল, রাপর, ধোসা, লুই প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার; আর কতকগুলি মোটা ও অপরিষ্কার। গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া মূল্যেরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

মেষাদির সর্ব্বাঙ্গের ঊর্ণা অপেক্ষা স্কন্ধদেশের ঊর্ণাই উৎকৃষ্ট

হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে পশুগণের গাত্র হইতে ঊর্ণা কাটিয়া লয়, এবং সেইগুলি ভাল মন্দ অনুসারে স্বতন্ত্র করিয়া বাছিয়া রাখে। পরে ঐগুলি জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করে, এবং চিরুণী দ্বারা আঁচড়াইয়া চরকায় সূত্র তুলিয়া লয়। তিব্বতদেশীয় ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয়। শাল প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইয়া থাকে। একখানি ভাল শাল দুই বৎসরের কমে সম্পূর্ণ হয় না। কাশ্মীরে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত হয়। ঐ সকল শালকে কাশ্মীরী শাল কহিয়া থাকে। অমৃতসরেও শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার নাম অম্রসাই। নেপালে অতি উত্তম কম্বল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কার্পেট, রাপর ও রামপুরী চাদর প্রভৃতি শীতবস্ত্রে নানা-বর্ণের পশম দেখিতে পাওয়া যায়। পশমে ইচ্ছানুসারে রঙ করিতে পারা যায়, এবং সূত্র কাটিবার পূর্ব্বেই লোকেরা উহা করিয়া থাকে।

৯ম—প্রবাল।

আমরা সচরাচর প্রবালকে পলা বলিয়া থাকি। প্রাচীনেরা ইহাকে "বিদ্রুমলতা" "লতামণি" বা "রত্নবৃক্ষ" কহিয়া গিয়াছেন। ইহা অনেক কাল আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে। দেশীয় রমণীরা স্বর্ণের অলঙ্কারের সঙ্গে প্রবাল গাঁথিয়া পরিধান

করিয়া থাকেন। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। প্রবাল তিন-প্রকার আছে; রক্ত, পীত ও শুভ্র। তন্মধ্যে শুভ্র ও রক্তবর্ণ প্রবালই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

বল্মীক যেরূপ উইপোকার আবাস-ভূমি, প্রবালও সেই-রূপ একপ্রকার কীটের আবাস-স্থান। এই কীট বিভিন্ন-জাতীয় দেখা যায়। ইহাদিগকে দেখিলে কখন প্রাণী বলিয়া বোধ হয়, কখন বা উদ্ভিদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে ইহাকে উদ্ভিদ বলিয়াই নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। মার্সেলিস-নগর-বাসী পেরোলিন্থ-নামক একজন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ত্রিশ বৎসর অনুসন্ধানের পর ইহাদিগকে প্রাণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভূমধ্য-সাগরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত সকলে প্রবালকীটগণ সহস্র সহস্র একত্র হইয়া আপনাদিগের শরীর-নির্গত একপ্রকার রস দ্বারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক কীটই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, এবং কিছু দিনের পর মরিয়া যায়। অন্যান্য কীটেরা আবার ঐ সকল আবাস-স্থানের উপরিই বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। এইরূপে প্রবাল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বড় বড় দ্বীপ হইয়া উঠে। প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাল-নির্ম্মিত অনেক দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অনেকগুলি বার তের ক্রোশ প্রশস্ত। কতক-গুলি বা সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৫০।৬০ হাত উচ্চ। এই সকল দ্বীপের অনেকগুলিতে মনুষ্যের বাস হইয়া গিয়াছে। জোয়ারের সময় ইহার পার্শ্বে সমুদ্র-বালুকা পতিত হওয়াতে এই দ্বীপগুলিও বিলক্ষণ উর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য

কৌশল! অতিসামান্য কীটেরাও মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরে এই-প্রকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ উৎপাদন করিতেছে!

১০ম—শিশির—কুজ্ঝটিকা—করকা—বরফ।

শীতকালের প্রত্যুষ-সময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চারি দিকে ভ্রমণ করিয়া দেখিলে, তৃণক্ষেত্র, বৃক্ষপত্র প্রভৃতি নানা স্থানে নির্ম্মল মুক্তার ন্যায় শিশিরবিন্দুর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষশ্রেণীর তলদেশে ফোঁটা ফোঁটা শিশির বিন্দু নিপতিত হয়। রাত্রিকালে কুজ্ঝটিকায় চারি দিক্ আচ্ছন্ন হইলে আকাশ ধূমময় বোধ হয়, এবং দূরবর্ত্তী পদার্থ সকল অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতে থাকে। রাত্রির মধ্যে এ শিশির কোথা হইতে আসিল, এরূপ ভাবিয়া দেখা উচিত। অনেকে মনে করেন, শিশির আকাশ হইতে পতিত হয়; ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। তাঁহাদিগের এই ভ্রম অনায়াসেই দূর হইতে পারে। শীত-কালের প্রভাত সময়ে তৃণক্ষেত্রে গিয়া তথায় ভূমির উপরি পতিত কোন পত্র তুলিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, পত্রের যে ভাগ ভূমির দিকে ছিল, সে ভাগেও শিশির লাগিয়া রহিয়াছে। যদি শিশির আকাশ হইতেই পড়িবে, তবে পত্রের নিম্ন দিকে কিপ্রকারে প্রবেশ করিল? বস্তুতঃ শিশির আকাশ হইতে পড়ে না, প্রত্যেক বস্তুতেই জন্মে।

প্রত্যেক বস্তুতেই শিশির জন্মে,—এ বিষয় বুঝিতে হইলে অগ্রে দুইটী বিষয় জানা উচিত। প্রথম, ভূতলস্থ জল সূর্য্যের কিরণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, তন্মধ্যে কতক অংশ মেঘরূপে পরিণত হয়, কতক বা বাষ্পাকারে বায়ুতেই থাকে। ঐ বাষ্প চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল বায়ু গাত্রে লাগিলে শীতল অনুভূত হয়। দ্বিতীয়, সূর্য্যতাপে জগতের সমস্ত বস্তুই উত্তপ্ত হয়, অর্থাৎ সকল বস্তুই সূর্য্য-তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে। বস্তু সকল দিবসে যে তাপ গ্রহণ করে, রজনীতে উহা আবার বিকিরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ বাহির করিয়া দেয়। সকল বস্তু ঠিক এক সময়ে তাপ বিকিরণ করিতে পারে না; কোন বস্তু অল্পকালের মধ্যেই তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হয়; যথা, তৃণ, পত্র, কাচ ইত্যাদি; কোন বস্তু বা অনেক ক্ষণের পর ঐরূপে শীতল হয়; যথা, মৃত্তিকা ইত্যাদি।

কোন বস্তু যখন সম্পূর্ণরূপে তাপ বিকিরণ করে, তখন উহাতে বায়ু লাগিবামাত্র ঐ বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, তাহা ঐ বস্তুর গাত্রে লাগিয়া জল হইয়া যায়। এই কারণে যে বস্তু যে পরিমাণে শীতল হয়, সেই বস্তুতে সেই পরিমাণে শিশির জন্মিয়া থাকে। একটী পত্র ও একটী ধাতুপাত্র উভয়ই রাত্রিকালে কোন অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিলে, প্রাতঃকালে দেখা যায় যে, পত্রেই অধিক শিশির লাগিয়াছে; তাহার কারণ, পত্র ধাতুপাত্র অপেক্ষা অধিক তাপ বিকিরণ করিয়া থাকে। একখণ্ড বরফ একটী কাচের পাত্রে রাখিলে, অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাচপাত্রের বহির্ভাগে শিশির

জমিয়াছে। ইহার কারণ, ভিতরে বরফ থাকাতে কাচপাত্রের তাপ সম্পূর্ণরূপে বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং বহির্ভাগে বায়ু লাগাতে তথাকার বাষ্প জমিয়া বিন্দু বিন্দু জলরূপে কাচপাত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়। এত অধিক পরিমাণে শিশির জন্মে যে, দেখিলে হঠাৎ বোধ হয়, যেন পাত্রস্থিত বরফ-জলই পাত্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে।

শিশির সর্ব্বকালেই জন্মিতে পারে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবামান অধিক, রাত্রিমান অল্প; এবং রবির তাপও অত্যন্ত প্রখর। রাত্রিকালে সেই তাপ সম্পূর্ণরূপ ঘুচিয়া বস্তু সকল শীতল হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার সূর্য্যোদয় হইয়া পড়ে; সুতরাং যেরূপ শীতল হইলে শিশির জন্মিবার সম্ভাবনা, গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে বস্তু সকল তত শীতল হইতে পায় না। এজন্য শীত-কালের ন্যায় শিশিরও জন্মে না। শীতকালেও যে রাত্রিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, সে রাত্রিতে তত শিশির উৎপন্ন হয় না। কারণ, বস্তু সকলের তাপ নির্গত হইয়া চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে না, মেঘে লাগিয়া পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, এবং বস্তু সকলে প্রবিষ্ট হয়; সুতরাং কোন বস্তুই উপযুক্তরূপ শীতল হইতে পায় না; এজন্য শিশিরও জন্মে না।

শিশির-উৎপত্তির কারণ একপ্রকার দেখান হইল; ইহা হইতেই কুজ্ঝটিকার কারণও বুঝিতে পারা যায়। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বায়ুও সূর্য্যের কিরণ হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে। রাত্রিকালে ঐ তাপ নির্গত হইয়া পড়িলে, বায়ুস্থ বাষ্প উপরি-ভাগেই জমিয়া বিন্দু বিন্দু পড়িতে থাকে। বায়ু যে রাত্রিতে যত শীতল হয়, কুজ্ঝটিকাও সেই রাত্রিতে সেই পরিমাণে জন্মে।

বৃষ্টিকালে কখন কখন করকা অর্থাৎ শিল পড়িয়া থাকে। তাহার কারণ, বৃষ্টির সময় উপরিস্থিত বায়ু এরূপ শীতল হয়, যে, মেঘ হইতে জল পড়িতে পড়িতেই পথিমধ্যে জমিয়া শিলের আকার ধারণ করে। করকা সময়ে সময়ে অতিশয় বৃহৎ হইয়াও থাকে।

পৃথিবীর অত্যুচ্চ পর্ব্বত সকলের উপরিভাগ চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন থাকে। তাহার কারণ, তত্রস্থ বায়ু সর্ব্বদাই অত্যন্ত শীতল; এজন্য মেঘ অথবা বাষ্পযুক্ত বায়ু তথায় যাইবামাত্র জমিয়া বরফ হইয়া যায়। এইরূপে বরফ ক্রমশঃ স্তরে স্তরে পড়িলে বরফ-রাশি উৎপন্ন হয়। নরওয়ে, সুইডেন, লাপলাণ্ড প্রভৃতি শীত-প্রধান দেশে এই ব্যাপার সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। তথায় শীতকালে সমুদ্র-জল জমিয়া এরূপ কঠিন হয় যে, উহার উপর দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারা যায়। সেই সকল দেশের লোকেরা শীতকালে সূর্য্যকে প্রায় দেখিতেই পায় না, সুতরাং তৎকালে বায়ু অত্যন্ত শীতল থাকে। গ্রীষ্মকালের আরম্ভে আবার ঐ সকল বরফ-রাশি গলিতে আরম্ভ হয়; এবং পূর্ব্বের ন্যায় জলাশয়ের উপরিভাগে জল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তথায় একপ্রকার কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কোন অনাবৃত স্থানে এক হস্ত গভীর একটী চৌকা কাটিয়া তন্মধ্যে তুষ খড় প্রভৃতি অপরিচালক বস্তু সকল স্থাপিত করিতে হয়; যে দিন অতিশয় শীত, সেই দিনের সায়ংকালে কতকগুলি মৃন্ময় শরাব (শরা) জলপূর্ণ করিয়া ঐ

তুষাদির উপর রাখিতে হয়। এইরূপ করিয়া রাখিলে শরাব সকলে বরফ জমিয়া থাকে। অধুনা অনেক স্থানে বরফ প্রস্তুত করিবার কল স্থাপিত হইয়াছে। গন্ধকদ্রাবক ও জল বরফের প্রধান উপকরণ।

বরফ অতি অল্প উত্তাপেই গলিয়া যায়; এজন্য করাতের গুঁড়া, তুষ প্রভৃতি অপরিচালক দ্রব্যের মধ্যেই উহা রাখিয়া থাকে। বায়ু লাগিলে বরফ হইতে ধূমের ন্যায় বাষ্প উঠিতে আরম্ভ হয়, এবং ক্রমশঃ উহা গলিয়া যাইতে থাকে; এজন্য লোকে সচরাচর কম্বল প্রভৃতি দ্বারাই বরফ জড়াইয়া রাখে। বরফ হস্তে করিয়া বহুক্ষণ রাখিতে পারা যায় না; রাখিলে ঐ স্থান হাজিয়া যায়, এবং দগ্ধ হইবার ন্যায় অত্যন্ত জ্বালা করে।

বরফ আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে। বিকারপ্রাপ্ত রোগীর মস্তকে বরফ দিলে উহা শীতল হয়; বিসূচিকা রোগে বরফ খাওয়াইলে বমন নিবারণ হয়, এবং উপরিভাগে এক খণ্ড বরফ বসাইলে রক্তপাত বন্ধ হয়। লোকে দুগ্ধ, লেবুর রস প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য টিনের পাত্রের ভিতর পুরিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখে, উহা লবণ ও বরফে পূর্ণ করিয়া দেয়; ক্ষণকাল পরে ঐ টিন-পাত্রের মধ্যস্থিত দ্রব্য সকল জমিয়া যায় এবং এক সুখাদ্য বস্তু প্রস্তুত হয়; তাহাকে লোকে কুল্পি বরফ কহিয়া থাকে।

১১শ—স্বর্ণ।

সমুদয় ধাতুর মধ্যে স্বর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উহা খনিজ পদার্থ; এবং কথন কথন বালুকাময় নদীতীরেও পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ অবস্থায় উহার বর্ণ উজ্জ্বল ও হরিদ্রার ন্যায় পীত, এবং দেখিতে অতি সুন্দর। অষ্টবিধ ধাতুর* মধ্যে প্রধান বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় ইহার একটী নাম অষ্টাপদ হইয়াছে। হিংস্র জন্তুর মধ্যে সিংহ যেমন, খনিজ ধাতুর মধ্যে সুবর্ণও সেইরূপ। সিংহ গম্ভীরস্বভাব, কষ্টসহ ও সহজে চটিয়া উঠে না; স্বর্ণও প্রায় সকল ধাতুর অপেক্ষা ভারী—জল অপেক্ষা প্রায় ১৯½ গুণ; এবং ভারসহ ও ঘাতসহ অর্থাৎ ইহার তারে অনেক ভার চাপাইলেও ছিঁড়ে না, এবং প্রচণ্ড আঘাতেও ইহা চটিয়া যায় না।

নম্রতা সাধুগণের স্বভাবজাত গুণ; কি শোক, কি ক্রোধ, কোন অবস্থাতেই তাঁহাদিগের স্বভাবের গুরুত্ব কমে না; এমন কি, কথন কথন মুখও বিকৃত হয় না। কিন্তু যখন তাঁহারা অসৎ ব্যক্তির সহিত মিলিত হন, তখন তাঁহাদের স্বভাব কর্কশ হইয়া উঠে। সুবর্ণও ঠিক সেইরূপ। প্রজ্বলিত অগ্নিতে গলাইলে ইহার ভার বিন্দুমাত্র কমে না, বর্ণও অন্য-প্রকার হয় না। ইহা বিশুদ্ধ অবস্থায় অতিকোমল থাকে; তখন ইহাকে অনায়াসে ইচ্ছামত নোয়াইতে পারা যায়। এজন্য কোন অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে হইলে, ইহার সহিত তাম্র

* স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীস, রঙ্গ, কান্তিলোহ ও তীক্ষ্ণলোহ।

মিশ্রিত করিয়া থাকে; তৎকালে ইহা কঠিন হইয়া উঠে। তাম্র-মিশ্রিত স্বর্ণকে আমাদিগের দেশীয় লোকেরা গিনি সোণা কহেন।

প্রাচীন ও নূতন মহাদ্বীপে স্বর্ণের অনেক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন্ স্থানে কোন্ পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? মানবের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে পেরু, চিলি, মেক্সিকো, কলম্বিয়া ও ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে অনেক স্বর্ণখনি উৎখাত হইয়াছে। কালিফর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় যত অধিক স্বর্ণের আকর পাওয়া গিয়াছে, পৃথিবীর আর কোন স্থানেই তত পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার কোন কোন নদীর তীরে বালুকার সঙ্গে স্বর্ণকণা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্ণ আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে। ইহাতে গিনি, মোহর প্রভৃতি নানাপ্রকার মুদ্রা এবং নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্বুবর্ণকে হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া অতিশয় পাতলা পাত প্রস্তুত করে; ঐরূপ পাতকে আমাদিগের দেশে সোণালী বলে। অতিসূক্ষ্ম সোণার তার রেশম বা রূপার তারে জড়াইয়া দিলে, সোণার জরী প্রস্তুত হয়; ঐ জরী নানা-বিধ বস্ত্র ও টুপির উপর বসাইয়া থাকে। আমাদিগের দেশীয় বৈদ্যেরা সুবর্ণে নানা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

রসায়ন-বিদ্যার উন্নতি হওয়াতে সুবর্ণের আর একপ্রকার উপকারিতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত পাত্র অথবা অপরাপর দ্রব্যের উপরিভাগ গিল্‌ট করা গিয়া থাকে। যে দ্রব্য গিল্‌ট করিতে

হইবে, তাহার উপর প্রথমতঃ পারা মাখাইয়া পরে সোণালী বসাইয়া দিতে হয়; শেষে অগ্নির উত্তাপ দিলে, পারা উড়িয়া গিয়া ঐ দ্রব্য অবিকল স্বর্ণের ন্যায় দেখায়। গিল্ট করিবার আরও কয়েকপ্রকার রীতি প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কোন কোনটীতে ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারি অর্থাৎ তাড়িতাঘাতের প্রয়োজন হয়।

১২শ—রৌপ্য।

ধাতুগণনার মধ্যে সুবর্ণের পরই রৌপ্যকে ধরিতে হয়। রৌপ্য একটী খনিজ ধাতু। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা স্বর্ণের ন্যায় নমনীয়, কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন বোধ হয়। তৎকালে ইহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল থাকে। জল অপেক্ষা রৌপ্য প্রায় ১০½ গুণ ভারী। স্বর্ণের ন্যায় ইহাতেও সূক্ষ্ম তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে।

কবিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যকে সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। সূর্য্যবর্ণনায় "কনককান্তি" এবং চন্দ্রবর্ণনে "রূপার থালা" প্রভৃতি বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। চাঁদের ন্যায় রঙ্ আছে বলিয়া, হিন্দীভাষায় রৌপ্যকে "চাঁদী" কহিয়া থাকে।

সুবর্ণের খনি অপেক্ষা রজতের খনি অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে; মেক্সিকো ও পেরু প্রভৃতি আমেরিকার দেশ সকলের

আকর হইতে প্রতি বৎসর যথেষ্টপরিমাণে রৌপ্য উত্তোলিত হয়। প্রাচীন মহাদ্বীপের অনেক স্থানেও অল্পপরিমাণে রৌপ্য পাওয়া গিয়া থাকে।

রৌপ্য আমাদিগের অনেক প্রয়োজনে লাগে। ইহাতে মুদ্রা, অলঙ্কার প্রভৃতি আবশ্যকীয় বস্তু প্রস্তুত হয়। ধনী লোকেরা ইহাতে গেলাস, পানের কৌটা প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ করাইয়া থাকেন। এই ধাতু হইতে এক পরম উপকারী ঔষধ প্রস্তুত হয়; ইংরেজি ভাষায় তাহাকে কষ্টিক (অপভ্রংশ—কাষ্টকি) বলে। যবক্ষার-দ্রাবকে (নাইট্রিক য়্যাসিডে) একখণ্ড রৌপ্য ফেলিয়া জ্বাল দিলে, তাহা গলিয়া যায়। পরে ঐ গলিত রৌপ্য কিয়ৎক্ষণ স্থির করিয়া রাখিলে কাষ্টকি প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ নূতন বা পুরাতন ব্রণ, শোথ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

খনিজ ধাতুমাত্রেই সচরাচর প্রথমে বিমিশ্র থাকে। পরে নানা প্রণালীতে তন্মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্য নিঃসারিত হইলে, উহা বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশুদ্ধ করিবার রীতি প্রায় একরূপ। বিমিশ্র ধাতুকে প্রথমে চূর্ণ করিয়া পারদের সহিত সম্যক্ মিশাইতে হয়। পারদ ধাতুর সহিত যতই মিশ্রিত হইতে থাকে, ধাতুর অন্তর্গত মলও ততই নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপ পারদযুক্ত ধাতুকে অগ্নির উত্তাপে গলাইলে, পারদ উড়িয়া গিয়া বিশুদ্ধ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। এই সংশোধন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার দেখা যায়।

১৩শ—লৌহ।

লৌহ (বা লোহ) একপ্রকার আকরিক ধাতু। আকরিক অবস্থায় ইহাতে গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। তদবস্থায় ইহা কৃষ্ণবর্ণ দেখায়; পরে অতিপ্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে বিশুদ্ধ হয়। গলিত লৌহের উপর যে মল বা গাদ ভাসিয়া উঠে, তাহাকে লৌহবিষ্ঠা (বা মণ্ডূর) কহে। লৌহ জল অপেক্ষা প্রায় পৌনে আট গুণ ভারী।

আমাদিগের দেশে তিনপ্রকার লৌহ প্রচলিত; ঢালা লৌহ, পেটা লৌহ, ও ইস্পাত। একটী ইটে গাঁথা মুচির ভিতর বিমিশ্র লৌহ অঙ্গারের সহিত রাখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড উত্তাপ প্রদান করিতে হয়; ক্রমে লৌহ গলিয়া নীচে পড়ে। এইরূপে ঢালা লৌহ প্রস্তুত হয়। ঢালা লৌহকে আরও তপ্ত করিয়া লৌহ-মুদ্গর দ্বারা পিটিয়া দীর্ঘ পাত করিলে, পেটা লৌহ হয়। এবং উত্তপ্ত পেটা লৌহ উষ্ণ অবস্থায় জলে ডুবাইলে অতি কঠিন ইস্পাত প্রস্তুত হয়। কিন্তু যদি জলে না ডুবাইয়া বাতাসে ক্রমশঃ শীতল করা যায়, তাহা হইলে নরম ইস্পাত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থলেই লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লৌহের ন্যায় প্রয়োজনীয় ধাতু আমাদিগের আর কিছুই নাই। অতিপূর্ব্ব কাল হইতে আমাদের দেশে এই ধাতু ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রন্ধন, বস্ত্রবয়ন, ভূমিকর্ষণ, গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি যে কোন কার্য্যই হউক, সকলেই এই ধাতুর প্রয়োজন হয়। অতিক্ষুদ্র বস্তু হইতে অতিপ্রকাণ্ড দ্রব্য

পর্য্যন্ত সমস্তই লৌহে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সূচী, পেরেক, স্ক্রুপ, কড়া, কোদাল প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বাষ্পীয় পোত (কলের জাহাজ) বা বাষ্পীয় যানের (রেলের গাড়ীর) দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, লৌহের অপরিসীম আবশ্যকতা বুঝিতে পারা যায়।

লৌহ একটী প্রধান পরিচালক ধাতু। এজন্য অনেকে বজ্রাঘাত হইতে রক্ষার্থ ইহা দ্বারা দীর্ঘ শীক প্রস্তুত করাইয়া বাটীর কোণে স্থাপিত করেন। অধুনা লৌহ অথবা তাম্রের তার বা পাত ব্যবহৃত হইতেছে।

লৌহ যে কেবল আমাদিগের বাহ্য প্রয়োজন সাধন করে, এরূপ নহে; ইহাতে আমাদিগের শারীরিক উপকারও হইয়া থাকে। বৈদ্যেরা ইহাতে নানাবিধ বলকারক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। লৌহঘটিত ঔষধ সেবন করিলে দেহে রক্ত জন্মে। এই কারণে, বোধ হয়, সংস্কৃত ভাষায় লোহ শব্দে রক্ত (লোহিত) ও লৌহ ধাতু উভয়ই বুঝায়। হিন্দীতে "লৌ" শব্দের অর্থ রক্ত। লৌহের উপর একপ্রকার মরিচা পড়ে, তাহা হইতে লাল রঙ্ প্রস্তুত হয়; এইজন্যই লাল রঙ্কে লোহিত বর্ণ কহিয়া থাকে।

বহুকাল পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে আর একপ্রকার লৌহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "অয়স্কান্ত মণি" বলিয়া থাকে। "চুম্বক প্রস্তর" উহার আর একটী নাম। চুম্বকের উপকারিতা দিগ্দর্শন যন্ত্রেই (কম্পাসে) বিশেষ প্রত্যক্ষ হয়। এই লৌহে নির্ম্মিত শলাকা নিরন্তর উত্তরমুখে থাকে। কম্পাস যন্ত্রের সৃষ্টি না হইলে, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিকালে অকূল

সমুদ্র মধ্যে নাবিকগণ কখনই নৌকা-সঞ্চালনে সাহসী হইত না। তাড়িতবার্ত্তাবহ বাষ্পীয় যানের পক্ষে যেরূপ, অয়স্কান্ত মণি জলযানের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। চুম্বকের অপর একটী গুণ এই যে, ইহা অন্যান্য লৌহকেও আকর্ষণ করে।

১৪শ—তাম্র।

আমরা যে পয়সা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহা তাম্র-ধাতু-নির্ম্মিত। তাম্র দেখিতে রক্তবর্ণ এবং জল অপেক্ষা প্রায় নয় গুণ ভারী। এই ধাতু গলাইতে স্বর্ণ বা রৌপ্য অপেক্ষা অধিকতর উত্তাপ প্রয়োজন করে, কিন্তু লৌহের ন্যায় ভয়ানক তাপ আবশ্যক হয় না।

বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র উভয়বিধ তাম্রই আকরে পাওয়া যায়। আকরিক অবস্থায় ইহা গন্ধক ও অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত থাকে। তুঁতের একটী উপকরণ তাম্র; এজন্য ইংরেজিতে ইহাকে "সল্‌ফেট্ অব্ কপর্ (তাম্র)" কহে।

পৃথিবীর অনেক স্থানে তাম্র উত্তোলিত হয়। তন্মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আসিয়ার কোন কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে তাম্র পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ তাম্র আমাদিগের যত উপকারে লাগে, অন্যান্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইলে তদপেক্ষা অনেকগুণে উপকারক হয়। বিশুদ্ধ তাম্রে পয়সা ও রন্ধনস্থালী নির্ম্মিত হয়; এবং

বিস্তীর্ণ পাত করিয়া জাহাজের তলভাগ মুড়িয়া দেয়। তাহাতে ভয়ানক জলজন্তুগণ জলযানের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, এবং জলমধ্যস্থ চুম্বক প্রস্তরও তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ তাম্র-পাত্র ব্যবহার না করিবার একটী বিশেষ কারণ এই, তাম্র-পাত্রে ক্ষণকাল অম্লরস রাখিলে, ঐ পাত্র বিষাক্ত হইয়া উঠে; এজন্য লোকে তাম্রনির্ম্মিত রন্ধন-স্থালীর অভ্যন্তর ভাগে রাঙের কলাই করিয়া থাকে। বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য যে সমস্ত পাত্রের প্রয়োজন, সমুদায়ই তাম্র-নির্ম্মিত; কারণ, অন্য বস্তুর সহিত ঘর্ষণ করিলে লৌহ হইতে যেরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তাম্র হইতে সেরূপ হয় না। তাম্র-ফলকে অতি পরিষ্কৃত ও অতি সূক্ষ্ম অক্ষর ও চিত্র ক্ষোদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে হিন্দুদিগের কোশা কুশী প্রভৃতি দেবপূজার উপযোগি পাত্র সকলও তাম্রে নির্ম্মিত হয়।

অন্যান্য ধাতুর সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া লোকে পিত্তল ও কাঁসা নামে অপর দুইটী নূতন ধাতু সৃষ্টি করিয়াছে। এক ভাগ দস্তার সহিত দুইভাগ তাম্র মিশাইলে পিত্তল প্রস্তুত হয়; এবং এক ভাগ রাঙের সঙ্গে তিন ভাগ তাম্র মিশ্রিত করিলে ভাল কাঁসা হইয়া থাকে। এই দুই ধাতুতে আমাদিগের ঘটী বাটী প্রভৃতি নানাবিধ গৃহসামগ্রী নির্ম্মিত হয়। পিত্তলের বর্ণ প্রায় বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায়,এবং কাঁসার বর্ণ প্রায় রৌপ্যের তুল্য। পিত্তল-নির্ম্মিত তারে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তামার ন্যায় পিতল বা কাঁসায় মরিচা ধরে না; কিন্তু ঐ সকল ধাতুতে নির্ম্মিত বাসনগুলি কিছুদিন না মাজিয়া ফেলিয়া রাখিলে,

উহাদের উপরিভাগে একপ্রকার কলঙ্ক উৎপন্ন হয়; ঐ কলঙ্ক অত্যন্ত বিষাক্ত; কিন্তু উহা হইতে একপ্রকার সবুজ রঙ জন্মে বলিয়া চিত্রকরেরা উহার যথেষ্ট আদর করিয়া থাকে। ঐ রঙকে ইংরাজী ভাষায় বর্দিগ্রীস্ বলে।

১৫শ—সীস।

সীস একপ্রকার খনিজ ধাতু। ইহা জল অপেক্ষা প্রায় সাড়ে এগার গুণ ভারী। ইহা অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অতি সহজে নোয়াইতে পারা যায়; এবং অতি অল্প অগ্নির উত্তাপেই ইহা গলিয়া যায়। রৌদ্রে, জলে অথবা মৃত্তিকার ভিতরে পড়িয়া থাকিলেও সীসে মরিচা ধরে না, কেবল উপরের উজ্জ্বলতাই নষ্ট হয় মাত্র। সীস অল্পপরিমাণে বিষাক্ত, এজন্য ইহা দ্বারা নির্ম্মিত ভোজনপাত্রাদি ব্যবহার করা উচিত নহে। ব্যবহার করিলে কিছু দিনের পর "লেড্-কলিক্" অর্থাৎ সীস-শূল নামক রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

সীস আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে। ইহাতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। সফেদা রঙ্ ইহা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সীসে ছিটে গুলি প্রস্তুত করে। তদ্ভিন্ন, সীসে নল, তার ও মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর প্রস্তুত হইয়া থাকে। সীসের আবরণে জড়িত লৌহময় নলে কলের জল প্রবাহিত হয়; তাড়িত বার্ত্তাবহের তার সকল সীস দ্বারা আবৃত। বাষ্পীয় রথের পথে [illegible] দেওয়া থাকে, তাহা সীসের তার দ্বারা নির্ম্মিত।

মুদ্রাযন্ত্রে দুইপ্রকার সীস ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কাঁচা ও পাকা। কাঁচা সীস অপেক্ষাকৃত কোমল ও ঈষৎ নীলবর্ণ; পাকা সীস তদপেক্ষা শুভ্রবর্ণ ও কঠিন। কাঁচা সীসে কিঞ্চিৎ রসাঞ্জন মিশ্রিত করিলেই পাকা সীস উৎপন্ন হয়। পাকা সীসে অক্ষর প্রস্তুত হয়, এবং কাঁচা সীসে লেড্ অর্থাৎ লম্বা সীসের পাত প্রভৃতি ঢালিয়া থাকে।

দুই ভাগ সীস ও এক ভাগ রাঙ্ একত্র মিশ্রিত করিয়া লোকেরা উত্তম পাইন্ প্রস্তুত করে; ঐ পাইন্ দ্বারা ঘটী বাটী গাড়ু প্রভৃতি ঝালিয়া থাকে। সীসে তাম্র ও রাঙ্ মিশ্রিত করিলে "পিয়ুটর" নামক একপ্রকার নূতন ধাতু উৎপন্ন হয়। উহাতে লোকেরা চাম্‌চে প্রভৃতি বাসন নির্ম্মাণ করে।

পৃথিবীর অনেক স্থানেই সীসের আকর আছে, তন্মধ্যে ইয়ুরোপেই উহা অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হইয়া থাকে। সীস আকরে প্রায়ই বিশুদ্ধ থাকে; কখন কখন গন্ধক ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। খনি হইতে তুলিয়া উচিতমত উত্তাপ দিলে সীসমধ্যস্থ গন্ধক উড়িয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ সীস পড়িয়া থাকে। রৌপ্যও এইরূপে সীস হইতে পৃথক্ করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাণিবিষয়ক রচনা।

১ম—মনুষ্য।

জগতের যাবতীয় প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বপ্রধান। মনুষ্য জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে বলশালী সিংহ, ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল, স্থূল-কায় হস্তী, অথবা বিষাক্ত সর্পকেও বশীভূত করিতেছে; বায়ু-বেগে নিরন্তর চঞ্চল সমুদ্রে সুখে যাতায়াত করিতেছে; ভূগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া নব নব বস্তু আবিষ্কার করিতেছে; আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়া আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলির অবস্থান, গতি ও দূরতা নির্ণয় করিতেছে; এবং নানাবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাদিগের অবস্থা ক্রমে উন্নত করিয়া তুলিতেছে। ঈদৃশ অসীম শক্তি অবলোকন করিয়া কোন কবি মানবকে "সৃষ্টির অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মানবের ক্ষমতা কোন কোন স্থলে বিফল হয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশ বিষয়েই সর্ব্বপ্রকারে আধিপত্য স্থাপন করে। সর্প দংশন করিলে আমরা কখন কখন মরিয়া যাই সত্য, কিন্তু সেই বিষাক্ত সর্পকেও ক্রীড়ার বস্তু করিয়া কৌতুক দেখাইয়া থাকি।

অন্যান্য প্রাণিগণের শরীরের ন্যায় মনুষ্যের শরীর নির্ম্মিত

হয় নাই। ইহারা দ্বিপদ, এবং সোজা হইয়া চলে। ইহাদিগের শরীরের চর্ম্ম শক্ত, পশম বা পক্ষে আবৃত নয়, এবং হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতির ন্যায় কর্কশও নহে। ডারুয়িন নামক এক-জন সাহেব মনুষ্যজাতিকে বানর-জাতীয় জীবের "পরিশোধিত সংস্করণ" বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে বানর হইতে বনমানুষ, এবং বনমানুষ হইতে মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ অনুমান প্রকৃত হউক বা না হউক, বাস্তবিক বানর ও মনুষ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই বোধ হয়, উক্ত জন্তুর "বা-নর", অর্থাৎ "বিকল্পে নর", অর্থাৎ "কতকটা নর", এই নামকরণ হইয়াছে।

মনুষ্যের দশটী ইন্দ্রিয়; তন্মধ্যে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। হস্ত, পদ প্রভৃতি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে মনুষ্য অন্যান্য অনেক জীবের সহিত প্রায়ই সমান।

মনুষ্যগণ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভাল বাসে। তাহারা একত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। দেশভেদে মনুষ্য নানা বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, এবং শাসন-প্রণালী নানা স্থানে নানাপ্রকার। তাহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনা করিয়া জগতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে পরাজিত করিয়া রাজত্ব করিতেছে। বনবাসী অসভ্যগণ দিনে দিনে সভ্যসংসর্গে সভ্য হইয়া উঠিতেছে। এবং কত শত সভ্য জাতিও অসভ্যদিগের দৌরাত্ম্যে একেবারে হীন অবস্থায় পতিত হইতেছে।

নারীগণ ন্যূনাধিক নয় মাস গর্ভধারণ করিয়া * একেবারে একটী বা দুইটী (কদাচিৎ তিনটীও) সন্তান প্রসব করে। প্রসূত সন্তানকে বহুদিন লালন পালন না করিলে, সে স্বয়ং কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিতে পারে না। মনুষ্যগণ সচরাচর প্রায় একশত বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তিকে একশত কুড়ি বৎসর বা ততোঽধিক কাল পর্য্যন্তও জীবিত থাকিতে দেখা গিয়া থাকে। †

* পশ্চিম দেশে প্রাণিগণের সন্তান-প্রসব-কাল এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে—

"নওমে নার, দশমে গাই,
এগারমে ভঁইষ, বারমে ঘোড়ী,
তেরমে গদ্ধই, চৌদ্দমে ঊঁট,
পনরমে হাথী।"

এই কালগণনার সহিত ইয়ুরোপীয় প্রাণিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের গণনায় কিছু কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

† নরা গজা বিশে শয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়।
বাইশ বল্দা, তের ছাগলা, গুণে গেছে বরা পাগ্‌লা॥

গজা অর্থাৎ হস্তী। হয় অর্থাৎ ঘোটক। বরা—অর্থাৎ বরাহমিহির নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা।

২য়—সিংহ।

পশুগণের মধ্যে সিংহ অতিশয় সাহসী ও বলবান্। ইহার উদারতা, গম্ভীরতা প্রভৃতি নানা মহৎ গুণ থাকাতেই ইহাকে পশুরাজ কহিয়া থাকে। ইহার আকার দেখিলেও, ইহাকে রাজা বলা নিতান্ত অন্যায় হয় না।—শরীর দুই তিন হাত উচ্চ ও পাঁচ ছয় হাত দীর্ঘ, সর্ব্বত্র পিঙ্গলবর্ণ চিক্কণ লোমে আবৃত; মুখমণ্ডল প্রায় গোলাকার ও বিস্তৃত; মধ্যে দুইটী হীরকবৎ উজ্জ্বল চক্ষু; দুই পার্শ্বে দুইটী গোলাকৃতি কর্ণ; মুখমধ্যে বড় বড় দংষ্ট্রা; হস্ত-পদে সুতীক্ষ্ণ নখর; এবং স্কন্ধদেশে সুদীর্ঘ আকুঞ্চিত সুন্দর কেশর। ইহার সম্মুখভাগ পশ্চাদ্ভাগ অপেক্ষা অতিবিশাল; এমন কি, ঠিক সম্মুখ হইতে দেখিলে পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল দুইখানি পার উপর একটী প্রকাণ্ড জটাধারী মুণ্ডমাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃতি গম্ভীর ও অকুতোভয়।

আসিয়া ও আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সিংহ জন্মিয়া থাকে, এবং মনুষ্যের গতায়াত-শূন্য কাননে অথবা গিরিগুহায় গিয়া বসতি করে। ইহারা মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত না হইলে জীবহিংসা করে না। মাংসাশী পশুদিগের মধ্যে এই গুণটী প্রায় দেখা যায় না। সিংহ কোন পশুকে দুই তিন বারে আক্রমণ করিতে না পারিলে আর তাহার অনুসরণ করে না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসে।

সিংহ শান্তপ্রকৃতি বটে, কিন্তু যখন রাগিয়া উঠে, তখন ইহার আকার অতি ভয়ানক হয়। কেশর সকল স্ফীত ও

চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত হইতে থাকে; এবং বজ্রাঘাতের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে। ব্যাঘ্রই হউক, আর হস্তীই হউক, যাহার উপর কুপিত হয়, যুদ্ধে তাহাকে যতক্ষণ পরাস্ত করিতে না পারে, ততক্ষণ ক্ষান্ত হয় না; পরাজিত করিতে না পারিলে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, তথাপি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় না। উহার সিংহনাদ শুনিয়া অন্যান্য বন্য পশু সে বন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।

কিন্তু যে কোন জন্তু যত বলবান্ই হউক, মনুষ্যের নিকট সকলেই হীনবল; মনুষ্য বুদ্ধিবলে সকলপ্রকার ভীষণ জন্তুকেই আপনার অধীন করিয়া ফেলে। আফ্রিকাবাসী কাফ্রিরা দুই তিন জন একত্র হইয়া বর্শা, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সিংহের প্রাণসংহার করে। কখন বা সিংহের গতায়াতপথে গর্ত্ত কাটিয়া তাহার উপরিভাগ তৃণপল্লবাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে; পরে যখন সিংহ সেই পথে যাইয়া গর্ত্তমধ্যে পতিত হয়, তখন তাহাকে বিনাশ করে।

সিংহীর স্কন্ধদেশে কেশর জন্মে না। ইহারা ছয় বৎসরে পূর্ণবয়স্কা হয়, এবং তিন মাস দশ দিন গর্ভধারণ করিয়া এক-বারে তিন চারিটী সন্তান প্রসব করে। সিংহশাবক পুষিলে পোষ মানে। ইহারা প্রতিপালকের উপকার কখন বিস্মৃত হয় না, এবং সুযোগ পাইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর ষাটি সত্তর বৎসর জীবিত থাকে।

৩য়—ব্যাঘ্র।

মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরে যেরূপ হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জলজন্তু বিচরণ করিতেছে, মহারণ্যের মধ্যেও সেইপ্রকার অতি ভয়ানক হিংস্র জন্তু সকল বাস করিতেছে। যাহাদিগের বিকট দর্শনে প্রাণিগণের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, যাহাদিগের গর্জ্জনে দূরবর্ত্তী জীবেরও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে, এবং যাহাদিগের আক্রমণে নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, ভারতবর্ষের অনেক অরণ্য সেইপ্রকার বিকটাকার হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি। ঈদৃশ জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্রই প্রধান। ব্যাঘ্রের আকৃতি দেখিতে যেরূপ ভয়ানক, ইহার প্রকৃতিও তদ্রূপ ভীষণ। ইহাদিগের শরীরের উচ্চতা ও বিশালতা প্রায় সিংহের সমান। কিন্তু সিংহের ন্যায় ইহাদিগের স্কন্ধে কেশর হয় না। সর্ব্বশরীর পীতলোহিতবর্ণ লোমে আবৃত, কেবল মুখ, গ্রীবা ও উদরের লোম শুভ্রবর্ণ। সর্ব্বাঙ্গে কাল কাল রেখা আছে, তাহাতেই ইহাদিগের চর্ম্ম অতিসুন্দর দেখায়। চীনদেশীয় ধনী লোকেরা ব্যাঘ্রচর্ম্মে গদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশীয় সন্ন্যাসীরাও এই চর্ম্ম আসনরূপে ব্যবহার করেন।

ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু; উদর পূর্ণ থাকিলেও ইহারা জীবহিংসায় পরাঙ্মুখ হয় না। যে জন্তুকে শীকার করে, অগ্রে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া শোণিত পান করে, পরে মাংস-ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত বলবান্; গো-মহিষাদি জন্তু পৃষ্ঠে বহন করিয়া অবলীলাক্রমে খাল নালা প্রভৃতি পার হইয়া পলায়ন করে। নরশোণিতই ইহাদের অধিক প্রিয় বস্তু।

কত শত লোক অরণ্যে কাষ্ঠ-আহরণার্থ যাইয়া ইহাদিগের মুখে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে।

স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না; ব্যাঘ্রজাতিই ইহার যথার্থ উদাহরণস্থল। ব্যাঘ্র কখনই পোষ মানে না, এবং বহুকাল লোকালয়ে থাকিলেও কোনরূপেই স্বীয় হিংস্র স্বভাব ত্যাগ করে না। এই বিষয়ে সিংহ হইতে এই জাতির সম্পূর্ণ প্রভেদ।

জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি ব্যাঘ্র-জাতিকে যেরূপ ভয়ানক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তাহাদিগকে তদ্রূপ অকুতোভয় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি এত দিনে বিলুপ্ত হইত। তিনি ব্যাঘ্রদিগের অন্তঃকরণে এক আশ্চর্য্য ভয় দিয়াছেন, এবং শরীরে একপ্রকার বহুদূরব্যাপী উৎকট দুর্গন্ধ করিয়া দিয়াছেন; তাহাতেই অন্যান্য প্রাণিগণ জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অগ্নি দেখিলে ব্যাঘ্রেরা অত্যন্ত ভয় পায়, এবং হঠাৎ কোনরূপে ভয় দেখাইতে পারিলে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। বর্ণিত আছে, কোন সময়ে এক বিবি হঠাৎ হস্তস্থিত ছত্র খুলিয়া ব্যাঘ্র তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

সিংহীর ন্যায় ব্যাঘ্রীও এককালে তিন চারিটী সন্তান প্রসব করে। শাবক অপহরণ করিলে, ব্যাঘ্রী অনুসন্ধান করিয়া অপহারকের বাটীপর্য্যন্ত যায়, এবং অপহরণের সমুচিত প্রতি-ফল দিয়া ক্ষান্ত হয়। ব্যাঘ্রের জীবন-কাল সিংহেরই তুল্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এই জন্তু জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ও উহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সকলে চিতাবাঘ, নাকেশ্বরী বাঘ প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন-জাতীয় ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের সুন্দরবনে অনেক ব্যাঘ্র বাস করে।

৪র্থ—কুক্কুর।

কুক্কুর আমাদিগের গৃহপালিত জন্তু। ইহার অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, বুদ্ধিমান্, সদা সতর্ক ও অল্পে সন্তুষ্ট। ইঙ্গিতমাত্রেই ইহারা প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, এবং তখনি তাহা সম্পাদন করে। ইহাদিগের নিকট কোন দ্রব্য রাখিয়া গেলে, ইহারা তাহা প্রাণপণে রক্ষা করে। কুক্কুরের ন্যায় প্রহরী দ্বিতীয় নাই। ইহারা অন্ধকার-রাত্রিতে অতি সাবধানে প্রভুর গৃহ রক্ষা করিয়া থাকে; কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলেই চীৎকার করিয়া উঠে, এবং যতক্ষণ প্রভু নিবারণ না করেন, ততক্ষণ ডাকিতে থাকে। ইহাদিগের শ্রবণশক্তি যেরূপ প্রবল, ঘ্রাণ-শক্তিও তদ্রূপ তীক্ষ্ণ। কোন চোর নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলে ইহারা যেরূপ টের পায়, দূরবর্ত্তী গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া স্বীয় শীকারের অনুসন্ধানও সেইরূপে করিয়া লয়।

কুক্কুরের চারি পায়ে অঙ্গুলির সংখ্যা সমান নহে। ইহা-দিগের সম্মুখের দুই পায় পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি আছে, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের দুই পায় চারিটীর অধিক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিক পরিশ্রম করিলে অথবা গ্রীষ্ম হইলে, আমাদিগের যেরূপ লোমকূপ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, কুক্কুরদের সেরূপ হয় না। ইহাদিগের জিহ্বা হইতে যে লাল নির্গত হয়, তাহাই ইহাদিগের ঘর্ম্মের স্বরূপ। এইনিমিত্ত দৌড়িবার সময় কুক্কুরেরা প্রায়ই জিহ্বা বাহির করিয়া যায়।

দেশ-ভেদে কুক্কুর নানাজাতীয় দেখা যায়; কতকগুলির

আকার লম্বা, কতকগুলি বা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও লোমশ। অনেক দেশের সভ্য জাতিরা কুক্কুরকে সন্তানের ন্যায় ভাল বাসেন, এবং তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা ক্রোড়ে করিয়া প্রতি-পালন করেন। কিন্তু আমাদের দেশে কুক্কুর অস্পৃশ্য পশুর মধ্যে গণ্য। এজন্য এদেশীয় কুক্কুরের এরূপ দুর্দ্দশা। ইহারা এত দুর্ব্বল ও ভীরু-স্বভাব, যে ইহাদের চিরশত্রু শৃগালেরাও কখন কখন ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

সময়ে সময়ে কুক্কুরদিগের একপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়, ঐ রোগে উহাদিগকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। সেই অবস্থায় উহারা যাহাদিগকে দংশন করে, তাহারাও কুক্কুরবৎ উন্মত্ত হইয়া উঠে। কুক্কুরদষ্ট ব্যক্তি জল ও আলোক দেখিলে অত্যন্ত ভয় পায়, এবং অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই ভয়ঙ্কর রোগ চিকিৎসার দ্বারা প্রায় আরোগ্য হয় না।

কুক্কুরী দুই মাস গর্ভধারণ করিয়া একেবারে পাঁচ সাতটা সন্তান প্রসব করে। তৎকালে উহারা সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, এবং অপেক্ষাকৃত উগ্রস্বভাব হয়। কুক্কুর সচরাচর পনর ষোল বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

৫ম—উষ্ট্র।

উষ্ট্র গৃহপালিত ও পরম উপকারী পশু। ইহারা শান্তপ্রকৃতি ও কষ্টসহ। ইহারা হস্তীর ন্যায় ভার বয়, অশ্বের ন্যায় মনুষ্য

বয় ও গাড়ী টানে, গাভীর ন্যায় দুগ্ধ দেয়, এবং গর্দ্দভের ন্যায় যৎসামান্য তৃণপত্রাদি খাইয়াই জীবিত থাকে।

উষ্ট্র দেখিতে সুশ্রী জন্তু নহে। ইহাদিগের গলদেশ লম্বা, গ্রীবা বক্র; পৃষ্ঠ কুব্জ; চক্ষু ও কর্ণ ক্ষুদ্র; ওষ্ঠ স্থূল, কিন্তু অধর পাতলা। ইহাদিগের পদতল স্পঞ্জের ন্যায় কোমল মাংসে ঘটিত। ইহারা উষ্ণপ্রধান দেশে জন্মে, সুতরাং জগদীশ্বর ইহাদিগকে তদনুরূপ অবয়বও দিয়াছেন। ইহাদের পৃষ্ঠের উপরি একটী ঝুঁটি আছে, উহা অতিশয় কোমল; কোন কোন জাতীয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে দুইটীও ঝুঁটি দেখিতে পাওয়া যায়।

আফ্রিকা, মিসর, পারস্য ও ভারতবর্ষে অনেক উষ্ট্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আরব দেশের মরুভূমি ও উষ্ট্রের আকৃতি এই দুইটী বিষয় একত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, উষ্ট্র আরবদেশীয়দিগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। আরবদেশের প্রায় সমস্ত ভাগই ভয়ঙ্কর মরুভূমি; তথায় জলাশয় নাই, কোন বৃক্ষও নাই; এমন কি, একগাছি তৃণপর্য্যন্তও দেখা যায় না; কেবল চারি দিকে বিস্তীর্ণ বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে ইহাই দৃষ্ট হয়। মধ্যাহ্ন সময় যখন প্রচণ্ড রৌদ্রে ঐ মরুভূমি উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তখন উহা আরও ভয়ানক হয়; অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত বালুকাকণা সকল বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া দশ দিক্ অন্ধকার করে। মস্তকে প্রখর দিনকর; পদতলে ও চতুষ্পার্শ্বে তীক্ষ্ণ শরবৎ বালুকাকণা; মধ্যে মধ্যে আবার উত্তপ্ত বায়ু শরীরে যেন অগ্নিবর্ষণ করিতে থাকে। ঈদৃশ ভীষণ স্থানে, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সময়ে, উষ্ট্রই আরবীয়দিগের একমাত্র সহায়, উহাই সেই বালুকা-সাগরে নৌকা-স্বরূপ।

উষ্ট্র, পৃষ্ঠে ভার বহন করিয়া, সেই দুস্তর বালুকারাশি পার হইয়া যায়। তাহারা চারি পাঁচ দিন আহার বা জলপান না করিয়াও প্রত্যহ ত্রিশ চল্লিশ, কখন বা একশত, ক্রোশ পর্য্যন্ত পথ ভ্রমণ করে। এরূপ কষ্টসহ পশু আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

উষ্ট্র ছয় বৎসরেই পূর্ণবয়স্ক হইয়া উঠে। ইহারা সচরাচর চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। উষ্ট্রী তের বা চৌদ্দ মাস গর্ভধারণ করিয়া একটীমাত্র সন্তান প্রসব করে।

৬ষ্ঠ—গরু—মহিষ।

আরবদেশে উষ্ট্র যেরূপ উপকারী, আমাদিগের দেশে গরুও তদ্রূপ। এজন্য হিন্দুরা এই পশুকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে এই প্রাণী আমাদিগের এক প্রধান সম্পত্তি ছিল; তজ্জন্য ইহার নাম গো-ধন হইয়াছে।

গরু তৃণভোজী পশু। ইহারা ঘাস, খড়, পাতা প্রভৃতি আহার করে, এবং ঐ গিলিত বস্তুগুলি পুনর্ব্বার উদ্গীর্ণ করিয়া চর্ব্বণ করে; এইরূপ করাকে রোমন্থ কহে। ইহাদিগের এক পাটী দাঁত; মস্তকের দুই দিকে দুইটী শৃঙ্গ; চারি পায়ের খুর খণ্ডিত; এবং পশ্চাদ্ভাগে একটী লম্বমান পুচ্ছ। ঐ পুচ্ছ এবং কর্ণ সঞ্চালন দ্বারা ইহারা দংশ-মশকাদি ক্ষুদ্র শত্রু নিবারণ করে; এবং শৃঙ্গ ও খুর দ্বারা অপরাপর বৃহৎ শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা পায়। এই পশুর গলদেশে

একখণ্ড কোমল চর্ম্ম ঝুলিয়া থাকে; তাহাকে গল-কম্বল কহে। এবং স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে একটী ঝুঁটি উঠে; তাহার নাম ককুদ্। তিব্বত প্রভৃতি প্রদেশে একপ্রকার গরু জন্মে; তাহাদিগের পুচ্ছ অতি রমণীয় ও চিক্কণ লোমে আবৃত। আমাদিগের দেশে ঐ পুচ্ছে চামর প্রস্তুত করে: তজ্জন্য ঐজাতীয় গরুকে আমরা 'চমরী গো' কহিয়া থাকি।

গরু অতি নিরীহ পশু। ইহারা বহু কষ্ট সহ্য করিয়া যাবজ্জীবন মানবের উপকার করিয়া থাকে। ইহারা প্রতি-পালককে বিলক্ষণ চিনিতে পারে, এবং যে স্থানে প্রতিপালিত হয়, প্রাণান্তেও সে স্থান ত্যাগ করিতে চাহে না। গরুদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। ইহারা ঘ্রাণ দ্বারাই সমস্ত বস্তু অব-গত হয়। শিক্ষা পাইলে ইহারা মনুষ্যের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারে।

মনুষ্যের ন্যায় ইহাদিগের সন্তান-স্নেহও দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসের মৃত্যু হইলে গাভীরা চক্ষুর জল ফেলিয়া থাকে, এবং তিন চারি দিন অনবরত চীৎকার করে। কিন্তু অধিক দিন হইলে, বৎসকে ভুলিয়া যায়; এইজন্য লোকে মৃতবৎসা গাভীর নিকট অন্য একটী বৎস আনিয়া দিলে, উহারা স্বীয় বৎস ভাবিয়া তাহাকে স্নেহ করিয়া থাকে।

গরু আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে। গাভীর সুমধুর দুগ্ধ পান করিয়া আমরা বলবান্ ও সুস্থশরীর হই। এই দুগ্ধ বালকদিগের প্রাণধারণের সর্ব্বপ্রধান সামগ্রী। এই দুগ্ধে ক্ষীর, দধি, ছানা, ঘৃত, নবনীত প্রভৃতি নানা উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান জীবনোপায় ধান্য,

গোধূম প্রভৃতি শস্য বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র এই পশুর সাহায্যেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিক কি, গরুর শরীরের সকল অংশই আমাদিগের কোন না কোন উপকারে আসে। ইহার চর্ম্মে জুতা, মশক প্রভৃতি,—অস্থিতে ছুরি ও নানাবিধ অস্ত্রের বাঁট.—শৃঙ্গ ও খুরে শিরীষনামক দ্রব্য, —নাড়ীভুঁড়ীতে তাঁত ও বাদ্যযন্ত্র,—এবং বিষ্ঠায় অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ইহার মাংস অধুনা হিন্দুভিন্ন সমস্ত জাতির আহার; রক্তে মস্ত পরিষ্কার করে; মূত্রে বস্ত্রের মল শোধন হয়, এবং বৈদ্যদিগের মতে প্লীহারোগ সারিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, বলদে আমাদিগের শকট ও ঘানী টানে এবং বোঝা বহন করিয়া বাণিজ্যের সহায়তা করে।

গৃহপালিত ভিন্ন আর একপ্রকার গরু আছে; তাহারা বনে বাস করে, এবং অপেক্ষাকৃত বলবান্ ও বৃহৎকায় হইয়া থাকে। কার্পেথিয়ান পর্ব্বত, এবং উত্তর আমেরিকার স্থানে স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদিগের দেশীয় গরু প্রায় পনর যোল বৎসর বাঁচিয়া থাকে। গাভী দশ মাস গর্ভধারণ করিয়া একবারে একটী (কদাচিৎ দুইটী) সন্তান প্রসব করে। প্রসবের পরক্ষণ হইতেই অনবরত লেহন করিয়া উহারা বৎসের ধাত্রীকার্য্য সম্পাদন করে।

মহিষ—অনেকাংশে গরুর সমান,এবং উহার ন্যায় উপকারী পশু। প্রভেদের মধ্যে,—মহিষের শৃঙ্গ দীর্ঘ, চর্ম্ম স্থূল ও কর্কশ এবং শরীর কিঞ্চিৎ বৃহৎ। গরু অপেক্ষা ইহাদের বল অধিক, এবং স্বভাবও অধিকতর উগ্র। ইহারা সর্ব্বদা শীতল স্থানে বা

জলে পড়িয়া থাকিতে ভাল বাসে। মহিষী প্রায় এগার মাস গর্ভধারণ করিয়া একবারে একটী সন্তান প্রসব করে। ইহার দুগ্ধে অপর্য্যাপ্ত ঘৃত প্রস্তুত হয়; তাহাকে আমাদিগের দেশে মাহিষ ঘৃত বা "ভয়ষা ঘী" কহিয়া থাকে।

৭ম—অশ্ব।

আমাদিগের উপকারী যাবতীয় গৃহপালিত পশুর মধ্যে অশ্ব অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। এই পশুর আকার দেখিতে অতি সুন্দর: শরীর দীর্ঘ, লঘু ও বলিষ্ঠ; চক্ষু সতেজ: স্কন্ধদেশ ও পুচ্ছ লম্বমান কেশরে আবৃত; এবং চারি পায়ের খুর অখণ্ড।

পূর্ব্বকালে অনেক দেশ হইতে অনেকপ্রকার অশ্ব আমাদিগের দেশে আনীত হইত। বাহ্লীক, পারসীক * প্রভৃতি নানাবিধ ঘোটক পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের সৈন্যের প্রধান অঙ্গ ছিল। এক্ষণে অন্যান্যদেশীয়ও অনেক অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বার্ব্বরি দেশের ঘোটক সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। তুরষ্কদেশীয় অশ্বও প্রায় তদ্রূপ। স্পেন ও ডেন্মার্ক দেশে নানা বর্ণের অশ্ব জন্মিয়া থাকে। আরবদেশীয় ঘোটক দীর্ঘ ও স্থূলকায়। বর্ম্মাদেশের অশ্ব ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু কর্ম্মক্ষম। ইংলণ্ডীয় অশ্ব অত্যন্ত বলবান্ ও সাহসী।

---

* বাহ্লীক অর্থাৎ বল্‌খদেশীয়, পারসীক অর্থাৎ পারস্যদেশীয়।

অশ্ব তৃণভোজী পশু। ইহারা ঘাস, খড়, ছোলা, যব, গোধূম প্রভৃতি শস্য ভক্ষণ করে, কিন্তু গরুর ন্যায় রোমন্থ করে না। এই আহারেই ইহারা গরু প্রভৃতি অন্যান্য পশুর অপেক্ষা অধিকতর বলবান্, সাহসী ও অতিশয় কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে। মানবজাতি এই পশুকে নানা কৌশলে বন হইতে ধরিয়া আনে, এবং কিছুকাল প্রতিপালন করিলেই ইহারা অত্যন্ত বশীভূত হইয়া উঠে।

ঘোটক মনুষ্যের পরমোপকারী পশু। ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লোকেরা বহুদূর গমনাগমন করিয়া থাকে। অশ্ব যুদ্ধস্থলের এক প্রধান সহায়। তথায় ইহাদিগের অসীম সাহস ও ধৈর্য্য অবলোকন করিলে ভীরুস্বভাব ব্যক্তিমাত্রেরই আশ্চর্য্য বোধ হয়। বল ও সাহস আছে বলিয়া সভ্য-জাতিরা এই পশুকে অতিশয় আদর করেন. এবং ইহাদিগকে শিক্ষা দিয়া "ঘোড় দৌড়" "ঘোড়ার নাচ" প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ করিয়া থাকেন। শীকারীরা ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অরণ্যে মৃগয়া করিতে যায়। এতদ্ভিন্ন ইহারা শকট বহন করে, এবং কোন কোন দেশে লাঙ্গলও টানিয়া থাকে।

অশ্ব একাকী বাস করিতে ভাল বাসে না। যখন ইহারা অরণ্যে বাস করে, তখন চারি পাঁচ শত একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলা যূথপতিও থাকে, তাহারা প্রহরীর কার্য্য করে, এবং বিপদ্ উপস্থিত হইলে সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়।

ঘোটক সচরাচর পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

ঘোটকী প্রায় বার মাস গর্ভধারণ করিয়া এককালে একটী সন্তান প্রসব করে।

৮ম—ছাগ—মেষ।

গরুর ন্যায় ছাগও মনুষ্যের প্রতিপাল্য পশু। ইহাদের শরীর চিক্কণ লোমে আবৃত; চারি পায়ের খুর দ্বিখণ্ড; এবং কোন কোনটার লম্বা দাড়ী উঠিয়া থাকে। কতকগুলি ছাগের গলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লম্বমান মাংসপিণ্ড জন্মিতে দেখা যায়। খাসীনামক ছাগেরা বলবান্ ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। কখন কখন ছাগদিগের গাত্র হইতে একপ্রকার উৎকট দুর্গন্ধ বহির্গত হয়; সেই সময় তাহাদিগকে "বোকা পাঁটা" কহে।

ছাগ তৃণভোজী পশু। ইহারা মেষ অপেক্ষা সাহসী ও সর্ব্বদা সতর্ক। অত্যুচ্চ পর্ব্বতপ্রদেশে অথবা জীর্ণ অট্টালিকার উপরিভাগে অকুতোভয়ে উঠিয়া তত্রত্য তৃণ ভক্ষণ করে। ইহারা অতিসঙ্কীর্ণ স্থানে চারি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। শিক্ষা দিলে ইহারা নানাপ্রকার কৌতুক শিখে।

জগতের নানাদেশে নানাবিধ ছাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বত দেশের ছাগেরা তদ্দেশীয়দিগের বাণিজ্য দ্রব্য বহন করে। সেই দেশের একপ্রকার ছাগের লোমে শাল, রুমাল প্রভৃতি বহুমূল্য শীতবস্ত্র নির্ম্মিত হয়। ছাগের মাংস অতিকোমল এবং সুস্বাদ। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ পবিত্র জ্ঞানে দেবদেবীর সমক্ষে

ইহাদিগকে বলি দেয়, এবং অতিশয় আগ্রহ করিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার চর্ম্মে জুতা, বাদ্যযন্ত্র, দস্তানা, পুস্তকের মলাট প্রভৃতি সামগ্রী নির্ম্মিত হয়।

ছাগী ছয় মাস গর্ভধারণ করিয়া একেবারে চারি পাঁচটী সন্তান প্রসব করে। ইহাদের দুগ্ধ অতি বলকারক; এজন্য অনেকে নিজ সন্তানদিগকে ঐ দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন। আমাশয় রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

দেশভেদে ছাগ ন্যূনাধিক বার তের বৎসর জীবিত থাকে।

মেষও—ছাগের ন্যায় গৃহপালিত পশু। ইহাদের শরীরও প্রায় ছাগের ন্যায়; কেবল গাত্রে সুদীর্ঘ লোম জন্মে এবং লাঙ্গূল কিঞ্চিৎ লম্বা হয়। দুম্ব-নামে একপ্রকার মেষ আছে, তাহাদের লাঙ্গূলে দশ বার সের মাংস জন্মে। কাবুল, পারস্য, বার্ব্বরি প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা ঐ দুম্ব মেষের লাঙ্গূল-মাংস সুখাদ্য বলিয়া ভোজন করে। মেষের শৃঙ্গ ছাগের শৃঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে বক্র।

ইহাদিগের প্রকৃতি শান্ত ও ভীরু। শত্রু আক্রমণ করিলে ত্বরায় পলায়ন করে। মেষদলের এক চমৎকার স্বভাব এই, অগ্রগামী মেষ যে দিকে ধাবমান হয়, অপর সকলেই সেই দিকে প্রস্থান করে। আহার ও রোমন্থ বিষয়ে ইহারা ছাগের সমান।

গ্রীস, সার্ডিনিয়া, তাতার প্রভৃতি দেশের অরণ্যে অনেক বন্য মেষ চরিয়া বেড়ায়। মেষমাংস শীতপ্রধানদেশীয়দিগের প্রধান আহার। ইহার লোমে কম্বল, বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র প্রস্তুত হয়। চর্ম্মে জুতা, পুস্তকের মলাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে।

ইহার দুগ্ধ মুখের ক্ষত রোগের মহৌষধ। অন্যান্য বিষয়ে ইহারা ছাগের অপেক্ষা অধিক ভিন্ন নহে।

৯ম—হরিণ।

হরিণ বনবাসী পশু, কিন্তু পালন করিলে পোষ মানিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে অতিসুন্দর; মস্তকে শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট সুদীর্ঘ বক্র শৃঙ্গ; চক্ষু সর্ব্বদা চঞ্চল ও রমণীয়; শরীরের লোম পাটলবর্ণ ও চিক্কণ, এবং মধ্যে মধ্যে নানাবিধ শ্বেতবর্ণ চিহ্নে সুশোভিত; লাঙ্গূল ক্ষুদ্র; চারিটী পদ কৃশ ও লম্বা; এবং সর্ব্বশরীর অতিলঘু, সুতরাং ইহারা অতিবেগে দৌড়িতে পারে।

ইহারা শান্তপ্রকৃতি ও অতি-ভীরু-স্বভাব; অতি অল্প শব্দ শুনিলেই পলায়ন করে। বনজাত কুশ, কাশ, ঘাস প্রভৃতি তৃণই ইহাদিগের আহার। ইহারা গরুর ন্যায় রোমন্থ করে। তপোবনে ইহারাই প্রশান্তমূর্ত্তি তপস্বিগণের একমাত্র সহচর।

দেশভেদে নানাবিধ হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বত ও চীনতাতার প্রভৃতি দেশের পর্ব্বতে কস্তূরীমৃগ নামে এক-প্রকার হরিণ জন্মে। এই হরিণের নাভিদেশে একপ্রকার গোলাকৃতি গুটিকা জন্মে, তাহাকে কস্তূরী বা মৃগনাভি কহিয়া থাকে। এই দ্রব্য অতিশয় সুগন্ধি এবং উত্তেজক ও বলকারক। এজন্য ইহা নানা কঠিন রোগের মহৌষধ হইয়াছে। ভারতবর্ষ,

িরস্য, চীন ও আফ্রিকার অরণ্যে একপ্রকার বিচিত্রবর্ণ মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে কৃষ্ণসার বা কালসার মৃগ কহে। কবিগণ এই কৃষ্ণসারের আকৃতি ও প্রকৃতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। লাপ্‌লাণ্ড প্রভৃতি দেশে বল্গাহরিণ নামে একজাতীয় মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ঘোটকের ন্যায় শকট বহনপূর্ব্বক বরফরাশির উপর দিয়া গমনাগমন করে। আরবদেশে উষ্ট্র যেরূপ উপকারী, লাপ্‌লাণ্ডপ্রভৃতি দেশে বল্গাহরিণও তদ্রূপ।

দেশবিশেষে হরিণ মনুষ্যের অনেক উপকার সাধন করে। লোকে ইহার মাংস খায়, ইহার চর্ম্মে জুতা, আসন ও শীতবস্ত্র নির্ম্মাণ করে, এবং ইহার নাড়ীতে তাঁত প্রস্তুত করিয়া থাকে। কোথায়ও ইহার দুগ্ধ পান করে, এবং কোন কোন স্থানে ইহার চর্ব্বিতে তৈলকার্য্যও সম্পাদন করে। হরিণের শৃঙ্গে ছুরি প্রভৃতি অস্ত্রের বাট প্রস্তুত হয়; এবং বৈদ্যেরা ইহাকে ঔষধ-রূপে ব্যবহার করেন।

হরিণী প্রায় আট মাস গর্ভধারণ করিয়া এককালে একটীমাত্র সন্তান প্রসব করে। হরিণ ছয় বৎসরে পূর্ণবয়স্ক হয়, এবং ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

১০ম—তিমি।

সমুদ্রের অভ্যন্তরে যতপ্রকার জলজন্তু আছে, তন্মধ্যে তিমি একটী প্রধান। সংস্কৃত গ্রন্থে তিমিঙ্গিল নামে একপ্রকার জলজন্তুর উল্লেখ আছে; তাহারা এরূপ বৃহৎকায় যে, তিমিকেও গিলিয়া ফেলিতে পারে। কিছুদিন হইল, ঈদৃশ একটী জন্তু সমুদ্রে দৃষ্ট হইয়াছে।

তিমির আকার এপ্রকার বৃহৎ যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এক একটা তিমি ষাটি সত্তর হাত দীর্ঘ ও বিশ পঁচিশ হাত প্রশস্ত হইয়া থাকে। আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত আছে, কতকগুলি বণিক সমুদ্রের উপরি ভাসমান কোন তিমির পৃষ্ঠভাগকে দ্বীপ মনে করিয়া তথায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, এবং রন্ধন করিবার জন্য অগ্নি প্রজ্বালিতও করিয়াছিল; পরে অগ্নির উত্তাপে তিমি জলমগ্ন হইলে, বণিক্দিগের দ্বীপ-ভ্রম ঘুচিয়া যায়। এই বর্ণনাটী যদিও উপন্যাস মাত্র, তথাপি ইহা দ্বারা তিমির আকার যে বৃহৎ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

তিমি শঙ্খ, শম্বূক প্রভৃতি নানাবিধ জলজন্তু ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। মহাকবি কালিদাস বর্ণন করিয়াছেন, তিমিগণ নদীমুখে মুখ বিস্তারিত করিয়া জলজন্তুসমেত নদীজল মুখমধ্যে প্রবেশিত করে, পরে মুখ বুজাইয়া মস্তকস্থিত ছিদ্র দ্বারা ঐ সমুদয় জল ঊর্দ্ধে বাহির করিয়া দেয়; সেই জলপ্রবাহ বহির্গত হইবার সময় প্রস্রবণের ন্যায় বোধ হয়। তিমির দন্ত নাই, একপ্রকার কঠিন অস্থি দন্তের কার্য্য সম্পাদন করে। এই অস্থিকে আমাদিগের দেশে কাঁচকড়া কহিয়া থাকে।

কাচকড়া আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে। ইহাতে চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি অনেক বস্তু নির্ম্মিত হয়।

তিমির শরীরে যথেষ্ট চর্বি জন্মে। লোকে সেই চর্বি তৈলের ন্যায় ব্যবহার করে, এবং তাহাতে বাতিও প্রস্তুত করিয়া থাকে। গ্রীন্‌লণ্ডের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে অনেক তিমি দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে যথেষ্ট কষ্ট করিয়া একটী তিমি মারিতে পারে। অনেকে একত্র হইয়া নৌকা আরোহণপূর্ব্বক, যে স্থানে তিমি ভাসমান হয়, সেই স্থানের কিয়দ্দূরে উপস্থিত হয়; এবং তথা হইতে সকলে তিমিকে লক্ষ্য করিয়া এককালে বর্ষা-নামক অস্ত্র নিক্ষেপ্ করে। ঐ সকল বর্ষার একপ্রান্তে সুদীর্ঘ রজ্জু বদ্ধ থাকে, এবং ঐ রজ্জুর অপর দিক নৌকাতে আবদ্ধ থাকে। তিমি বর্ষা দ্বারা আহত হইয়া জলমধ্যে মগ্ন হইতে আরম্ভ করে; লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে রজ্জু ছাড়িতে থাকে, এবং নৌকা বাহিয়া তীরে উপস্থিত হয়। বর্ষাঘাতে তিমি যত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, উহারাও ততই রজ্জু গুড়াইতে থাকে। এইরূপে অতিকষ্টে একটী তিমি তীরে আনীত হয়।

স্ত্রী-তিমি একবারে একটীমাত্র সন্তান প্রসব করে, এবং তাহাকে মনুষ্যের ন্যায় স্তন্যপান করাইয়া থাকে। সন্তান যতদিন আপনাকে পোষণ করিতে না পারে, ততদিন তাহাকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে, এবং সমস্ত বিপদ্ হইতে রক্ষা করে।

১১শ—সর্প।

সর্পজাতি অতি ভয়ঙ্কর জন্তু। ইহারা প্রাণিগণের পক্ষে মূর্ত্তিমান্ যম-স্বরূপ। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোনটা এরূপ বিষাক্ত যে, দংশন করিবামাত্র জীবগণ অচেতন হইয়া পড়ে, এবং অল্প ক্ষণের মধ্যে তাহাদিগের শরীর নিস্পন্দ ও নীলবর্ণ হইয়া উঠে। সর্পকে "আশীবিষ" বলিয়া থাকে, তাহার কারণ এই—ইহাদিগের মুখের উভয় প্রান্তে আশী-নামক এক-প্রকার দন্ত আছে, সেই দন্তের মধ্যে তৈলবৎ একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। ঐ পদার্থকে সর্পবিষ কহে। সর্পবিষ জীবগণের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবামাত্র, হৃৎপিণ্ডে স্থিত রক্তের গতি বন্ধ হইয়া যায়, এবং অবিলম্বেই মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তির কি অপূর্ব্ব প্রভাব! তাহারা সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীকেও বশীভূত করিয়া জনসমাজে নানা কৌতুক দেখায়। বিষবৈদ্যেরাও তাহার দন্তস্থিত সেই ভয়ঙ্কর গরলকে ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া মানবজীবন রক্ষা করিয়া থাকে।

সর্পের শরীর লম্বা, গোল ও লাঙ্গূলের দিকে ক্রমশঃ সরু। ইহাদিগের পা নাই, বক্ষঃস্থলের মাংস সঙ্কোচ ও প্রসারণ করিয়া গমন করে। কোন কোন জাতীয় সর্পের মস্তকে ফণা থাকে। সহজ অবস্থায় উহা দেখা যায় না, কিন্তু ইহারা রাগিলেই বিস্তীর্ণ ফণা বাহির করে। অনেক সর্প শরীরের উপর ভর দিয়া প্রায় দুই হাত উচ্চ হইতে পারে। আমাদিগের দেশে বহুকালাবধি প্রবাদ আছে, সর্পজাতির কর্ণ নাই, চক্ষু দ্বারাই ইহারা শ্রবণ করিয়া থাকে। এজন্য ইহাদিগের একটী নাম

"চক্ষুঃশ্রবা" হইয়াছে। আর একটী প্রবাদ এই যে, ইহারা বায়ু ভক্ষণ করে; তজ্জন্য ইহাদিগকে "পবনাশন" কহিয়া থাকে। দুইটী জিহ্বা থাকাতে ইহাদিগের "দ্বিজিহ্ব" নামও হইয়াছে।

ভেক, ইন্দুর, ছুঁছা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সকল সর্পজাতির আহার। প্রকাণ্ড সর্পগণ কখন কখন ছাগ বা মেষ-শাবকও ভক্ষণ করিয়া থাকে। সকলজাতীয় সর্পই যে বিষাক্ত, এরূপ নহে। আমাদিগের দেশে যতপ্রকার সর্প আছে, তন্মধ্যে পাঁচ সাত প্রকার সর্পই বিষাক্ত। কেউটে, গোক্ষুর, উদয়কাল, শঙ্খচূড় প্রভৃতি সর্প ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক। এদেশে বোড়া, ময়াল ও বরাচিতে সর্পই বৃহৎ বলিয়া গণ্য। কিন্তু আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে নানাপ্রকার সর্প আছে, তন্মধ্যে বোয়া নামে একজাতীয় সর্পের আকার এত বড় যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা প্রায় দ্রুতবেগে যাইতে পারে না। যখন ভূতলে পড়িয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে প্রকাণ্ড শালগাছের গুঁড়ি বলিয়া বোধ হয়। তাহাদিগের গর্জ্জন-শব্দ অনেক দূর হইতে শুনা যায়; এবং প্রশ্বাসের আকর্ষণে অনেক জীব তাহাদের মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। আফ্রিকা দেশে আরও অনেকপ্রকার বৃহৎ ও বিষাক্ত সর্প দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্পজাতি মধ্যে মধ্যে শরীরের খোলোস পরিবর্ত্তন করে। খোলোস পরিত্যাগের পর কিছুদিন ইহাদের স্বভাব অত্যন্ত উগ্র থাকে। কেউটে প্রভৃতি কয়েকটী ভিন্ন অধিকাংশ সর্পের স্বভাব এই, যে, তাহাদিগের কোন অনিষ্ট না করিলে তাহারা মনুষ্যের অপকার করে না। সর্প সকল সচরাচর পুরাতন

গৃহের দেওয়ালে অথবা ক্ষেত্রের আলির পার্শ্বস্থিত গর্ত্তে বাস করে এবং উষ্ণস্থানে থাকিতে অধিক ভাল বাসে। অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে কোনপ্রকার সর্পই প্রায় জন্মে না।

সর্পী একবারে অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। ঐ সকল ডিম্ব ফুটিয়া সর্পশিশু নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে, জননী অধিকাংশই আহার করিয়া ফেলে। যে কয়েকটী সরিয়া পড়ে, সেইগুলিই জীবিত থাকিয়া বড় হয়। সর্পজাতি অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে। কোন কোন প্রকার সর্পকে পঁচিশ ত্রিশ বৎসরও জীবিত থাকিতে দেখা যায়।

১২শ—পক্ষী।

পক্ষিজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদিগের সমুদয় শরীর পালকে ঢাকা। ঐ পালকগুলি আবার নানাবর্ণে চিত্রিত। ইহাদিগের শরীর লঘু, এবং দুই পার্শ্বে দুইখানি পক্ষ (ডানা) আছে। সেই পক্ষের সাহায্যে ইহারা আকাশে উড়িতে পারে, এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে অনায়াসে চলিয়া যায়। অনেকের পশ্চাৎ ভাগে পুচ্ছ থাকে। কোন কোন পক্ষীর পুচ্ছ এরূপ মনোহর যে, মনুষ্যগণ তাহা লইয়া আপনা-দিগের টুপিতে দিয়া থাকেন।

পক্ষীদিগের দুই পা। ইহাদিগের দন্ত নাই, সমস্ত খাদ্য দ্রব্য গিলিয়া খায়। ইহারা অণ্ড প্রসব করে; ঐ সকল অণ্ড

উপযুক্ত উত্তাপ পাইলে ফুটিয়া যায়, এবং তন্মধ্য হইতে ছানা বাহির হয়।

দেশভেদে নানা আকৃতি ও নানা প্রকৃতির পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি শীকারী, তাহাদিগের দ্বারা লোকে অন্য পক্ষী ধরিয়া লয়; যেমন শ্যেন, উৎক্রোশ ইত্যাদি। কতকগুলি পক্ষী জলে সন্তরণ দিয়া বেড়ায়, এবং জলমধ্যস্থ কীট পতঙ্গাদি ধরিয়া খায়; যেমন হংস, সারস, পানকৌড়ি ইত্যাদি। জলচর পক্ষীদিগের পায়ের অঙ্গুলি সকল পাতলা চর্ম্ম দ্বারা জোড়া, তদ্দ্বারা তাহারা জলে সাঁতার দিতে পারে। কতকগুলি পক্ষী শিক্ষিত হইলে মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিয়া থাকে; যেমন শুক, শালিক, ময়না ইত্যাদি। বুলবুল প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে লোকে লড়াই করিতে শিক্ষা দেয়।

পক্ষীরা দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহাদিগের কণ্ঠস্বরও তেমনি মধুর। কতকগুলির স্বর কর্কশ সত্য, কিন্তু অধিকাংশ পক্ষীরই স্বর অতি মিষ্ট। আমাদিগের সঙ্গীত-স্বর প্রায় পক্ষীদিগের স্বরের অনুকরণ করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে। কোকিলের স্বরের নাম পঞ্চম স্বর; ময়ূরের স্বরের নাম ষড়্জ স্বর ইত্যাদি।

গৃহপালিত পক্ষীর মধ্যে শুক, শালিক, কপোত, কুক্কুট ও হংস প্রধান। মনুষ্যগণ ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে আমোদের জন্য পুষিয়া থাকেন, কতকগুলিকে বা মাংস বা ডিম্ব ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রতিপালন করেন।

কতকগুলি পক্ষীর পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ও সন্তান-স্নেহ দেখিতে পাওয়া যায়। সারস পক্ষীর বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি যত্ন বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। অনেক পক্ষী স্বয়ং

আহার না করিয়াও স্বীয় সন্তানদিগকে আহার করায়। যত দিন পর্য্যন্ত তাহারা উড়িতে না পারে, তত দিন তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে করিয়া রাখে এবং বিপদ হইতে রক্ষা করে।

পক্ষীজাতি প্রায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। অনেকে এরূপ আশ্চর্য্য বাসা প্রস্তুত করে, যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কেহ কেহ বা বৃক্ষের কোটরে অথবা ভূমির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া বাস করে।

১৩শ—মধুমক্ষিকা।

পরিশ্রমী প্রাণীদিগের মধ্যে মধুমক্ষিকাই প্রধান। ইহারা দিবসে সর্ব্বদা পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া মধু সংগ্রহ করে, এক মুহূর্ত্তও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে না। সন্ধ্যার সময় নিজ নিজ চক্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যায়। ইহারা একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ। ইহাদিগের দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত; ঐ দুই খণ্ড একমাত্র চর্ম্মদ্বারা সংযুক্ত। ইহাদিগকে প্রায় তাম্র ও ধূসরবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই মক্ষিকা অতি অপূর্ব্ব কৌশলে নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। পুরাতন দেওয়ালের গর্ত্তে অথবা বৃক্ষের শাখায় এই বাসস্থান নির্ম্মিত হয়। ইহাকে মৌচাক কহে। মৌচাক আকারে বৃহৎ, কিন্তু অতিলঘু। ইহাতে অসংখ্য গর্ত্ত থাকে। প্রায় প্রত্যেক গর্ত্তে এক একটী ডিম্ব জন্মে। অল্প দিনের

মধ্যে ঐ সকল ডিম্ব হইতে পোকাগুলি বাহির হয়, এবং উহা-দিগের পদ ও পক্ষ উঠে; পরে উহারা মৌমাছির আকার ধারণ করে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এবং রুসিয়া ও জর্ম্মনি দেশের অরণ্যে অনেক মধুমক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মৌচাক হইতে আমরা মধু ও মোম প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মধু আমা-দিগের খাদ্য ও নানা রোগের ঔষধ। মোম আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে। ইহাতে বাতি প্রস্তুত হয়, এবং ক্ষতরোগের শোষক একপ্রকার মলম হইয়া থাকে। মোমঢাল নামে একপ্রকার কাপড় আছে, তাহা সামান্য বস্ত্র অথবা চটের উপর মোম গলাইয়া ঢালিয়া দিলেই প্রস্তুত হয়। কোন দ্রব্য ডাকে পাঠাইতে হইলে লোকেরা উহা মোমঢাল দিয়া মুড়িয়া পাঠাইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্ভিদ্‌বিষয়ক রচনা।

১ম—নারিকেল বৃক্ষ।

জন্তু-মধ্যে গরু যেমন আমাদিগের উপকারী, বৃক্ষ-মধ্যে নারিকেল বৃক্ষও তদ্রূপ। এই বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গই আমাদিগের প্রয়োজনে লাগে। ইহার আকার দীর্ঘ ও গোল, এবং অগ্রভাগে শাখা ও ফল জন্মে। এই বৃক্ষ যখন সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হয়, তখন ইহার দৈর্ঘ্য ৬০।৭০ হাতও হইয়া থাকে। ইহার পত্র লম্বা এবং শাখার দুই পার্শ্বে জন্মে। শাখার গোড়াকে এ দেশে বাগ্‌লো বা গাম্‌ড়ো বলে। ইহার ফলের অবস্থাভেদে বিশেষ বিশেষ নাম আছে;—শৈশবাবস্থার নাম মুচি, যৌবনাবস্থার নাম ডাব, প্রৌঢ়াবস্থার নাম দুর্ম্মো, এবং পরিণত অবস্থার নাম ঝুনো। মুচিগুলি যে গুচ্ছে জন্মে, তাহাকে চুমরী কহিয়া থাকে, এবং এক গুচ্ছে যতগুলি নারিকেল জন্মে, তাহাকে এক কাঁদি কহে। নারিকেল যত বাড়িতে থাকে, ততই তাহার মধ্যে জল জমে; পরিশেষে সেই জল মরিয়া ক্রমে শাঁস হইয়া উঠে। নারিকেলে যখন বিন্দুমাত্র জল থাকে না, তখন তাহাকে খড়েল বলে।

এই বৃক্ষ প্রায়ই লোণা দেশে জন্মিয়া থাকে। যে দেশের জল লোণা নহে, তথায় ইহা রোপণ করিলে অধিক বাড়ে না। এজন্য সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে এই বৃক্ষ যত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে তত দেখা যায় না। বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজে ইহা অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অনেক স্থানেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

নারিকেল বৃক্ষ আমাদিগের অনেক উপকারে লাগে।—ইহার ফল পরম উপাদেয় খাদ্য; ইহার শাঁস শুষ্ক করিয়া তৈল প্রস্তুত করে; খোলে হুক্কা ও বোমা বাজি প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ফলের উপরিভাগে যে ছাল থাকে, তাহার নাম ছোবড়া। এই ছোবড়ায় দড়ী, কাছি প্রভৃতি বন্ধনসামগ্রী এবং গদি প্রভৃতি শয্যা ও পাপোষ প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহার পত্রের কাটীতে ঝাঁটা নির্ম্মাণ করে। শুষ্ক পত্র ও চুমরী চমৎকার জ্বলে। ইহার দীর্ঘ গুঁড়িতে যাতায়াতের সেতু প্রস্তুত করে এবং কখনও ইহা বৃহৎ বাসগৃহের খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন নারিকেল-সন্দেশ, ছাপা, চন্দ্রপুলী প্রভৃতি মিষ্টান্ন দ্রব্যের উপকরণও এই বৃক্ষের ফল হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারিকেল-খণ্ড প্রভৃতি ঔষধও ইহা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার ফোঁপল সুখাদ্য বলিয়া লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

নারিকেল বৃক্ষ আট দশ বৎসরে ফলবান্ হয়, এবং এক শত বৎসরেরও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে।

২য়—আম্র বৃক্ষ।

ফলকর বৃক্ষের মধ্যে আম্র একটী প্রধান। ইহারা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রকাণ্ড হয়, এবং নিবিড় পত্রে আবৃত হইয়া ছায়া প্রদান করে। আমাদের দেশে আম্র বৃক্ষ তিন প্রকারে উৎপন্ন হয়;—১ম, আঁটি রোপণ করিলে তন্মধ্য হইতে অঙ্কুর বহির্গত হয়, সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপ ধারণ করে; ২য়, যোড়কলম :—অপর আর একটী চারা গাছ কোন বৃহৎ বৃক্ষের সরু ডালের সহিত একত্র দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায়। যোড়কলম আঁটির চারার ন্যায় দীর্ঘ হয় না এবং অধিক-সংখ্যক ফলও প্রদান করে না; কিন্তু অল্পকাল-মধ্যেই ফলবান্ হইয়া উঠে। ৩য়, গুলকলম :—প্রাচীন বৃক্ষের ডালের সন্ধিস্থলে গোময়, মৃত্তিকা, খৈল ও পচা মাছ ইত্যাদি দ্রব্য একত্র-মিশাইয়া ক্যাম্বিস বা চটে করিয়া বন্ধন করিয়া রাখে; পরে ঐ স্থান হইতে শিকড় নির্গত হইলে উহা কাটিয়া মৃত্তিকায় রোপণ করে। গুলকলম প্রাচীন বৃক্ষের ঠিক সমান হয়, এবং ত্বরায় যথেষ্ট ফল প্রসব করে। আঁটির চারার ফলের আস্বাদ প্রাচীন বৃক্ষের ফলের আস্বাদের সমান না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কলমে প্রায় সমানই হইয়া থাকে।

আম্র বৃক্ষ দেশ-ভেদে নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে,—হনুমান্ সিংহলদ্বীপ হইতে সর্ব্বপ্রথমে এই ফল আর্য্যাবর্ত্তে আনয়ন করে। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অনেক স্থানে এই বৃক্ষ

দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে মালদহ প্রভৃতি স্থান আম্রের জন্য বিখ্যাত। পশ্চিম প্রদেশে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট আম্র জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে সকলগুলির আস্বাদ সমান নহে। আস্বাদের বিভিন্নতা অনুসারে আমাদের দেশে আম্রফলের নানাবিধ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে; যথা, বোম্বাই, ন্যাংড়া, কাঁচামিটে, গোপালে-ধোপা, কিষণ-ভোগ, ফজলী, ক্ষীরপুলি, রাঢ়ী, কলামোচা, হেষ্টিংস ইত্যাদি।

আম্র বৃক্ষ আমাদিগের অনেক উপকার সাধন করে। ইহার গুঁড়ি চিরিয়া আমরা তক্তা করি; ইহার ফল আমাদিগের উপাদেয় খাদ্য, এবং ইহার শাখা প্রশাখা আমাদিগের জ্বালাইবার সামগ্রী। আম্রের তক্তায় আমাদিগের বাক্স, সিন্দুক, কবাট, তক্তপোষ প্রভৃতি দ্রব্য নির্ম্মিত হয়; এবং আম্র ফল হইতে লোকে কাসুন্দি, আমচুর, আমসত্ত্ব প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে। এ দেশে আম্র-বৃক্ষের বাগান সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

আম্র বৃক্ষ (আঁটির চারা) দশ বার বৎসরে ফলবান্ হইয়া এক শত বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকে। পৌষ মাসের শেষ ভাগ হইতে আম্রবৃক্ষে মুকুল জন্মিতে দেখা যায়। আম্র মুকুলকে আমরা সচরাচর "আমের বোল" বলিয়া থাকি। অল্প কোয়াসায় আম্র-মুকুল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু গাঢ় কোয়াসা হইলে নষ্ট হইয়া যায়। বসন্তকালে কোকিলগণ আম্র-মুকুল ভক্ষণ করিয়া মধুরস্বরে গান করিয়া থাকে।

৩য়—বংশ।

পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের উপকারী বৃক্ষ মধ্যে বাঁশ একটী প্রধান। ইহা তাহাদিগের প্রধান সম্পত্তি। ইহার আকার দীর্ঘ ও ক্রমে সরু হইয়া অগ্রভাগে অতিসূক্ষ্ম হইয়া থাকে। ইহার সর্ব্বাঙ্গে প্রায় এক হাত অন্তর গ্রন্থি বা গাঁইট জন্মে; সেই গাঁইট হইতে সরু সরু শাখা নির্গত হয়; তাহাকে কঞ্চি কহে। কঞ্চির গাত্রে বংশের পত্র সকল উৎপন্ন হয়। বংশ সকল এক স্থানে অনেক জন্মে; তাহাকে বাঁশের ঝাড় কহে। এক এক ঝাড়ে ১০০।১৫০ বাঁশ জন্মিয়া থাকে; এবং তন্মধ্যে কোন কোন বাঁশ ৩০।৪০ হাত লম্বা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশভেদে সরু ও মোটা বাঁশ জন্মে; মোটা বাঁশের মধ্যে কোন কোনটা এত স্থূল হয়, যে, তাহার বেড় দেড় হাতও হইয়া থাকে।

আমাদিগের দেশে অনেকপ্রকার বাঁশ জন্মে। তন্মধ্যে ভাল্কো, বাঁশিনী, বেইড়, জাওলা ও তল্‌দা প্রধান। কীচক নামে একপ্রকার বংশ পর্ব্বতময় প্রদেশে দেখা যায়, তাহার গাত্রে ছিদ্র হয়। যে সকল বাঁশের গাঁইট অতি নিকট নিকট জন্মে, তাহারা পুরু ও শক্ত হয়; আর যাহাদের গাঁইট অন্তর অন্তর, তাহারা পাতলা ও কম-শক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার বাঁশের মধ্যে ভাল্কো সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত ও ভারী, এবং তল্‌দা সর্ব্বাপেক্ষা অশক্ত ও হাল্কা। বাঁশ তিন বৎসরে পরিণত হয়; পরিপক্ক বাঁশ কিছু দিন জলে ফেলিয়া রাখিলে উহা দীর্ঘ-কালস্থায়ী হয়, এবং ঘুণাদি কীটে তাহা কাটিতে পারে না। বাঁশিনী অথবা জাওলা বাঁশে অতিসূক্ষ্ম শলাকা প্রস্তুত হইতে

পারে। বাঁশ চিরিলে যে সকল খণ্ড হয়, সে সকলকে এ দেশে বাকারি কহে।

ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অনেক স্থানে অনেক বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। খাল, বিল বা নদীর কূলে অপর্য্যাপ্ত বংশ জন্মিয়া থাকে। একটী বাঁশের মূল রোপণ করিলে, কালক্রমে তাহা হইতে একটী প্রকাণ্ড ঝাড় উৎপন্ন হয়। পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্ক অথবা সার ঝাড়ের গোড়ায় দিলে. ঐ ঝাড়ের বাঁশ অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাড়িয়া উঠে। বাঁশের মূল অতিশয় কঠিন।

বংশ আমাদিগের বড় প্রয়োজনীয়। ইহাতে গৃহ, সেতু প্রভৃতি আবশ্যক বস্তু সকল প্রস্তুত হয়, এবং কুলো, ধুচুনি, চুবড়ি, ঝুড়ি প্রভৃতি গৃহ-সামগ্রীও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহাই ডোমজাতির ব্যবসায় চালাইবার একমাত্র উপকরণ। কুটীরের আড়া ও দেওয়াল, বাগানের বেড়া, মৎস্য ধরিবার পলো ও ঘনি—ইত্যাদি নানা দ্রব্য বংশ হইতে নির্ম্মিত হয়। চীন ও বর্ম্মাবাসীরা তদ্দেশীয় বংশে নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করেন। অধিক দিন হইলে বংশ শুষ্ক হইয়া যায়; তখন উহা চমৎকার জ্বালাইবার সামগ্রী হয়।

৪র্থ—তাম্বূলীলতা (পাণ)।

পাণ অতি সুখী লতা। ইহা অধিক তাপ, অধিক বৃষ্টি, অধিক ঝড়, অধিক শীত—কিছুই সহ্য করিতে পারে না। এই লতা অতিযত্নে রোপণ করিতে হয়, এবং সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান না করিলে মরিয়া যায়। যে স্থানে পাণ রোপণ করা যায়, তাহাকে বরোজ কহে। বরোজের গঠনপ্রণালী অতি পরিপাটী। ইহা অতি উচ্চ ভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং পাকাটী বা শর দ্বারা ইহার চারি পার্শ্বের বেড়া ও ছাদ প্রস্তুত করা হয়। পাকাটী বা শরগুলি নিকট নিকট করিয়া এরূপে পুতিতে ও বাঁধিতে হয়, যাহাতে অল্প সূর্য্যকিরণ ও অল্প বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, অথচ ভিতরে অন্ধকার না হয়। বরোজের ভিতর খৈল, সার প্রভৃতি দিয়া উত্তমরূপে মৃত্তিকার পাট করিতে হয়, পরে দীর্ঘ দীর্ঘ আলি করিয়া তাহার উপর সমান ব্যবধানে পাণের ডাল রোপণ করিতে হয়। প্রত্যহ জলসেচন করাতে ঐ লতা যখন কিঞ্চিৎ বাড়িয়া উঠে, তখন প্রত্যেকটীতে একটী একটী পাকাটী অথবা শর খাড়া করিয়া পুতিয়া দিতে হয়; ঐ দণ্ড অবলম্বন করিয়া তাম্বূলীলতা ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। এইরূপে প্রায় চারি হাত উপরে উঠিয়া যখন বরোজের ছাদ স্পর্শ করে, তখন লোকেরা ঐ লতা নিম্নমুখ করিয়া দিয়া ঐ পাকাটী বা শরে জড়াইয়া দিতে থাকে। এ দিকে মূলদেশে যে সকল পত্র জন্মে, সেইগুলিই তাহারা অগ্রে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, ক্রমে উপরের পত্রগুলিও ভাঙ্গিয়া লয়।

চৈত্র বা বৈশাখ মাসে পাণ রোপিত হয়; এবং বর্ষাকালে

ঐ গাছে অনেক নূতন পত্র জন্মে। এজন্য শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে আমরা বাজারে অনেক নূতন পাণ দেখিতে পাই। নূতন পাণ পুরাতন পাণ অপেক্ষা অধিক ঝাল।

আমাদের দেশে সচরাচর দুইপ্রকার পাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে;—ঝেলো এবং ছাঁচি। কর্পূরবৎ গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার পাণ আছে, তাহাকে কর্পূরকাত পাণ কহে। ছাঁচি পাণের বর্ণ হরিদ্রার ন্যায়; ইহা কিঞ্চিৎ পুরু এবং অতিশয় সুস্বাদ।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র তাম্বূলীলতা উৎপন্ন হয়। এই লতার উৎপাদকদিগকে এ দেশে বারুই কহে। বারুইয়েরা পাণ ভাঙ্গিয়া প্রথমতঃ বাটীতে লইয়া যায়, পরে ঐ পাণ সাজাইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করে। সাজাইবার সময় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রগুলি ভিতরে রাখিয়া বৃহৎগুলি গোছের উপর-নীচে দেয়। আট গণ্ডা পাণে এক গোছ (গুচ্ছ) এবং নয় গোছে এক কোণা হইয়া থাকে।

এক্ষণকার সভ্য জাতিরা তাম্বূলচর্ব্বণ অসভ্যতা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাম্বূলচর্ব্বণের একটী প্রধান গুণ আছে। আহারের পর তাম্বূলচর্ব্বণ করিলে বমনের সম্ভাবনা থাকে না, এবং জিহ্বা হইতে অনবরত লাল নিঃসৃত হইয়া পরিপাকের কিঞ্চিৎ সাহায্যও করে। আর তাম্বুলের সহিত চূর্ণ ভক্ষণ করাতে পাকস্থলীর অজীর্ণ দোষ হেতু যে অম্ল জন্মে, তাহারও তেজ কম হয়। উড়িষ্যা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা অধিক সংখ্যায় তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া থাকে। কথিত আছে, পশ্চিমদেশীয় কোন প্রাচীন নগরে ষাটি হাজার পাণের দোকান ছিল।

৫ম—ধান্য।

মানবের আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে বঙ্গদেশে ধান্যই সর্ব্ব-প্রধান। ধান্য কৃষকগণের অনেক পরিশ্রমের ধন। ইহা ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে। লাঙ্গলদ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন বা রোপণ করিলে ধান্য উৎপন্ন হয়। মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হইলে সে বৎসর প্রচুর শস্য পাওয়া যায়; ইহার কারণ, সেই সময়ে কৃষকেরা একবার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া রাখে, পরে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে পুনরায় কর্ষণের পর বীজ বপন করে; সেই বীজ বাড়িয়া উঠিলে, শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে উহা রোপণ করে। যে বৎসর উপযুক্ত সময়ে আবশ্যকমত বৃষ্টি হয়, সে বৎসর যথেষ্ট পরিমাণে শস্য পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু যে বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে শস্য জন্মে না, সে বৎসর দুর্ভিক্ষ হয়।

ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তথায় বীজ বপন করিলে, প্রথমতঃ ঘাসের ন্যায় হরিদ্বর্ণ অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। ঐ অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইলে, তিন চারিটী একত্র করিয়া অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করে। ক্রমে ঐ অঙ্কুর এক একটী গুচ্ছ বা স্তম্ব হইয়া দাঁড়ায়। কালে উহার অগ্রভাগ হইতে শীস বাহির হয়, এবং ঐ শীসে অনেক ধান্য জন্মে। ক্রমে ঐ ধান্যগুলি পাকিয়া উঠে। এই সময়ে কৃষকগণ উহা কর্ত্তন করিয়া গৃহে লইয়া আসে, এবং তক্তার উপর আছড়াইয়া ধান্য ও খড় স্বতন্ত্র করে।

ধান্য সচরাচর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; আশু, শালি ও ব্রীহি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফলে বলিয়া, এক শ্রেণীর নাম আশুধান্য (আউশ ধান্য) হইয়াছে। শরৎ কালে যে ধান্য

পাকে, তাহার নাম শালিধান্য (বোরো)। আর পৌষ মাঘ মাসে যাহা পরিণত হয়, তাহাকে ব্রীহি বা হৈমন্তিক (আমন) ধান্য কহে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকপ্রকার ধান্য আছে; সেগুলি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষ ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অনেক স্থানে এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে নানাবিধ ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গদেশই ধান্যের উৎপত্তি-স্থান। এখানে অনেকপ্রকার ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে—পাটনাই, বোরো, নোণা, কালী, ধলিকালান্দী, কণকচূড়, হরিণখুরে, গোপালভোগ, বাসবতী, রাঁধুনীপাগল, গোখুরি, বেনাফুলি, কেশেফুলি, রামশালি, কার্ত্তিকশালি, পরমান্নশালি, মরিচশালি, দাদখানি, বাকতুলসী, বালাম প্রভৃতি অসংখ্য ধান্য বঙ্গভূমির উৎপন্ন।

ধান্য হইতে চাল্ বাহির করিবার প্রণালী দুই প্রকার;—এক প্রণালীতে আতপ এবং অপর প্রণালীতে সিদ্ধ তণ্ডুল প্রস্তত হয়। আতপ অর্থাৎ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কুট্টিত করিলে যে চাল্ হয়, তাহার নাম আতপ-তণ্ডুল; আর অগ্নিতাপে জলের সহিত সিদ্ধ ও পরে শুষ্ক করিয়া কুট্টিত করিলে যে চাল্ হয়, তাহার নাম সিদ্ধ। সিদ্ধ অপেক্ষা আতপ-তণ্ডুল অধিক সারবান্ ও বলকারক, এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ আতপ-তণ্ডুল ভক্ষণেরই বিধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গবাসীদিগের পরিপাক করিবার শক্তি কম বলিয়া আতপ-তণ্ডুলের অপেক্ষা লঘুপাক সিদ্ধান্নই অধিক প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি অনেক স্থানে বালাম চাল্ই ভদ্র-সমাজের অধিক ব্যবহার্য্য। বাখরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও কালীগঞ্জ এই তিন

স্থান হইতে বালাম চাল্ সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। কিন্তু সচরাচর আতপ-তণ্ডুলই বিদেশীয় বণিক্‌গণ দ্বারা বিভিন্ন দেশে নীত হইয়া থাকে। কাপড়, কাগজ বা অন্যান্য দ্রব্যে মাড় দেওয়া প্রভৃতি নানা কার্য্যের নিমিত্ত ইয়ুরোপীয় বণিকেরা এ দেশ হইতে আতপ-তণ্ডুল লইয়া যান।

ধান্য হইতে চাল্ বাহির করিবার সময় তিনটী দ্রব্য পাওয়া যায়;—তুষ, খুদ ও কুঁড়। ধান্যের খোসার নাম তুষ; কুট্টিত তণ্ডুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার নাম খুদ; এবং চাল্ কাঁড়িলে যে গুঁড় বাহির হয়, তাহার নাম কুঁড়। এই তিন দ্রব্যই প্রায় গো, মহিষ প্রভৃতি পশুর আহার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালবিষয়ক রচনা।

১ম—সময়।

কবিগণ সময়কে নদীস্রোতের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, উভয়ই অনবরত অনন্ত ধারায় ধাবমান হইতেছে; এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণ যেমন নদীর স্রোতে ভাসিয়া যায়; সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীবগণও সময়ের স্রোতে জীবন যাপন করিয়া চলিতেছে। আর জলজন্তুগণ যেমন সময়ে সময়ে অগাধ জলে নিমগ্ন হয়, প্রাণীরাও সেইরূপ প্রতিক্ষণে সময়ের প্রবাহে বিলীন হইয়া যাইতেছে। কোন জীবই চিরজীবন প্রাপ্ত হয় নাই, সকলেরই জীবনকালের সীমা আছে। সকলেই কিছুকাল জীবিত থাকিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারেন না। অতএব যখন জীবন অনিত্য দেখা যাইতেছে, তখন সেই অল্প জীবনকাল যাহাতে সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ভাবিয়া দেখিলে আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই বৃথা যাপিত হয়। বাল্যকাল প্রায় আহার, নিদ্রা ও ক্রীড়াতেই কাটিয়া যায়; অতি অল্পকালমাত্র বিদ্যা-উপার্জনে ব্যয়িত হইয়া

থাকে। তখন সময় যে কিরূপ অমূল্য ধন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। পরে যখন বয়োবৃদ্ধি হয়, তখন যে কতপ্রকার বৃথা কার্য্যে সময় যাপিত হয়, তাহা বলা যায় না। সমাজের কার্য্যবশতঃ অথবা শারীরিক অসুস্থতা হেতু আমাদিগের অনেক সময় অতীত হয়। আমাদিগের অজ্ঞতা ও অবিবেচনার দোষেও যথেষ্ট সময় বৃথা নষ্ট হয়। এই সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা সৎ কার্য্যে যাপন করা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। বৃথা গল্প বা অসৎ কার্য্যে সেই অল্প সময়ের অপব্যয় করা কোনমতে উচিত নহে।

সময় একবার অতীত হইলে আর কখনই ফিরে না। বর্ত্তমান কালই আমাদিগের অধীন। অতীত বা ভবিষ্যৎ সময়ের উপর আমাদিগের কোন ক্ষমতা নাই। কোন সৎ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইলে উহা শীঘ্রই করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। কালি করিব বলিয়া রাখিয়া দিলে, হয় ত তাহা কখনই সম্পন্ন হইয়া উঠে না। অতীত কালের নিমিত্ত আক্ষেপ করা যেমন নিষ্ফল, ভবিষ্যতের আশাও সেইপ্রকার নিরর্থক। ভবিষ্যৎ মৃগতৃষ্ণার স্বরূপ। * সকল বস্তুই ভবিষ্যতে সুন্দর দেখায়, কিন্তু উহার অতি অল্প অংশই আমরা

* প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় তৃষ্ণার্ত্ত মৃগগণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে জল রহিয়াছে ভাবিয়া সেই দিকে ধাবমান হয়, কিন্তু জল পায় না। তাহাকে মৃগতৃষ্ণা বা মরীচিকা কহে।

পাইয়া থাকি। অতএব ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করা আমা-দিগের কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

অনেকে আক্ষেপ করেন যে, সময় না থাকায় আমরা অনেক অভিলষিত সৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু বৃথা কর্ম্মে যে কত সময় নষ্ট হইতেছে, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। উপযুক্তরূপে সময় ভাগ করিয়া কার্য্যে লাগাইতে পারিলেই, আমাদিগের আর সময়ের অভাব থাকে না। সময় এরূপে বিভাগ করা উচিত, যাহাতে আমরা কতক কাল আহার নিদ্রা প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে যাপন করিতে পারি; কতক সময় জ্ঞানলাভার্থ গ্রন্থ-পাঠ করিতে পারি; কতক ক্ষণ বা সৎকার্য্যে ক্ষেপণ করিতে পারগ হই; আর, কিছু কাল বা বিষয়-কর্ম্মে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই। এরূপ না করিলে, সময়ের ন্যূনাধিক্য হেতু আমাদিগের সকল সৎকার্য্যেরই ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। কেহ আহার-নিদ্রায় অধিক কাল ক্ষেপণ করেন; কেহ জ্ঞানো-পার্জ্জনেই অনেক সময় অতিবাহিত করেন; কেহ বা নিন্দনীয় আমোদ-প্রমোদে জীবনের অধিকাংশ কাল অপব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা উপযুক্তরূপে সময় বিভাগ করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা জগতের অনেক হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন।

সময়ের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি নাই; অনবরতই সমান ধারায় চলিতেছে। কিন্তু আমরা স্ব স্ব অবস্থা অনুসারে তাহার দ্রুত ও মন্দ গতি অনুভব করিয়া থাকি। আমাদিগের সুখের দিন অতি শীঘ্র যায়, কিন্তু দুঃখের নিশার অবসান হয় না। আমা-

দিগের ভাবি সুখ ও বর্ত্তমান দুঃখের মধ্যবর্ত্তী কাল অতি দীর্ঘ ও কষ্টকর বোধ হয়। কার্য্যে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিদিগের সময় অতি শীঘ্র অতীত হয়, কিন্তু নিষ্কর্ম্মা ও অলস-প্রকৃতি লোক-দিগের সময় অতি কষ্টে কাটিয়া থাকে।

২য়— শৈশবকাল।

শৈশব অতি সুখের সময়। এই সময়ে অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ থাকে। জগতের সমস্ত বস্তুই আনন্দময় বোধ হয়। দুরাশা বা দুশ্চিন্তা প্রভৃতি ক্লেশকর প্রবৃত্তি সকল কিছুই থাকে না। তখন যৌবন-সুলভ ক্রোধাদি রিপু সকলের তাদৃশ প্রভাব থাকে না; জরা-সুলভ অনন্ত চিন্তা বা মর্ম্মান্তিক বেদনা বিন্দুমাত্র অনুভূত হয় না। সামান্য বিষয়েই আনন্দ, সামান্য কথাতেই হাস্য, সামান্য বস্তুরই আলোচনা এবং সামান্য-দ্রব্য-লাভেই নৃত্য। তখন, লজ্জা-ভয়, অপমান-ভয় বা নিন্দা-ভয়, কিছুই থাকে না। ক্ষণে রোদন, এবং পরক্ষণেই হাস্য।

শৈশব মানব-জীবনের প্রভাত-স্বরূপ। প্রাতঃকালে যেমন নিশার অন্ধকার থাকে না, দিবাকরের নবীন আতপ অল্পে অল্পে বিকশিত এবং জগতের পদার্থ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়; ধরাতল যেমন অভিনব শোভা ধারণ করে, এবং জীবগণ যেমন নিদ্রাবসানে প্রফুল্লচিত্ত ও শান্তপ্রকৃতি হইয়া থাকে; শৈশবকালেও সেইরূপ। এ সময় মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অসূয়া

প্রভৃতি অসৎবৃত্তি প্রায় দেখা যায় না; আশা-সরোবরের তরঙ্গ সকল একটী একটী করিয়া উত্থিত হয়; কল্লোলের ন্যায় ভয়ঙ্কর দুরাকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না; এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই আনন্দময় বোধ হয়। জ্ঞানের অঙ্কুর ক্রমশঃ উৎপন্ন হইতে থাকে, সুখের নূতন নূতন বিষয় প্রকাশিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শৈশব জ্ঞানোপার্জনের উপযুক্ত সময়। এ সময় অন্তঃকরণ অতি কোমল ও সরল, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, এবং নূতন নূতন বিষয় শিখিবার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী থাকে। শিশু-দিগের মন কুম্ভকারের মৃত্তিকার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, স্বর্ণকারের গলিত সুবর্ণ-পিণ্ডের ন্যায় ইচ্ছা-নুযায়ী আকারে সংঘটিত হইতে পারে, এবং নবজাত ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় যেমন ইচ্ছা সেইরূপেই নোয়াইতে পারা যায়। শিশুগণের চিত্ত, যে পথে লইয়া যাওয়া যায়, সেই পথেই যাইবে, যেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া যায়, সেইরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবে, এবং যেরূপ আচরণ অভ্যাস করিবে, যাবজ্জীবন সেইরূপ অভ্যাস থাকিয়া যাইবে। অতএব বালকদিগকে বাল্যকালেই সদুপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঐ সময় কোনপ্রকার অসৎ প্রবৃত্তির অভ্যাস হইলে, পরে তাহা দূর করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে।

৩য়—যৌবনকাল।

যৌবন শৈশব ও বৃদ্ধাবস্থার মধ্যস্থল। এই কালে শারীরিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক বৃত্তি সকলেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠে; ইন্দ্রিয়গণ সতেজ ও রিপু সকল প্রবল হয়; এবং ভোগেচ্ছা ক্রমে ক্রমে অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হইতে থাকে। শৈশবে যে সকল কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইত না, এখন সেই সকল কার্য্যে লজ্জা বা নিন্দাভয় উপস্থিত হয়। শৈশবে আমাদিগের বিবেচনা-শক্তি বা হিতাহিত-জ্ঞান আচ্ছন্ন-ভাবে থাকে, কিন্তু যৌবনে উহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। শৈশবে অন্তঃকরণ ভাবনাশূন্য, নিরুদ্বেগ ও সদা সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু যৌবনে নানাবিধ গুরুতর চিন্তা আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করে। শৈশব অতি সুখের সময়, কিন্তু অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত; যৌবন অতি বিষম কাল, কিন্তু জ্ঞানরূপ আলোকে উজ্জ্বল।

যৌবন সংসারে প্রবেশ করিবার প্রথম সময়। এই প্রবেশ-কালে দুইটীমাত্র পথ যুবকের নয়নগোচর হয়; একটী ধর্ম্ম-পথ, আর একটী অধর্ম্ম-পথ। ধর্ম্ম-পথ সম্মুখভাগে সঙ্কীর্ণ, কিন্তু পশ্চাৎ ভাগে প্রশস্ত ও রমণীয় পরিদৃশ্যমান হয়; অধর্ম্ম-পথ সম্মুখভাগে মনোহর বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত ও নিরাপদ্ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পশ্চাৎ ভাগে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও বিপৎসঙ্কুল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই উভয় পথের মধ্যে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। কারণ, ধর্ম্মপথে অসীম সুখ, অধর্ম্মপথে অশেষ দুঃখ।

যৌবনে উৎসাহ-শক্তি বলবতী থাকে। দেশের উন্নতি,

পরোপকার, বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, ধর্ম্মালয় বা ঔষধালয় স্থাপন প্রভৃতি যে সকল মহৎ কার্য্য মানবের কর্ত্তব্য, সেই সকল গুরুতর ব্যাপারে যুবক ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর হয়। কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও যুবা কখন নিরস্ত হয় না; সুতরাং অনেক স্থলে অবিবেচনার কার্য্যও করিয়া ফেলে। প্রবীণেরা যুবকের সেই সকল আচরণ দেখিয়া উপহাস করেন। অতএব উৎসাহ ও সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করা যুবকগণের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

যৌবনের প্রারম্ভে আমাদিগের অন্তঃকরণে কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। সেগুলি আমাদিগের উপযুক্তমত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আছে। যদিও সেই প্রবৃত্তিগুলি একবারে দমন করা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত বোধ হয় না; কিন্তু উহাদিগের নিতান্ত অধীন হইয়া থাকাও কখন তাঁহার অনুমোদিত নহে। সময়বিশেষে সেগুলির যথোচিত ব্যবহার করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। কোন বিষয়েরই আধিক্য ভাল নহে। যে পরিমাণে যে প্রবৃত্তির আলোচনা করা যায়, সেই পরিমাণেই তাহার অধীন হইয়া উঠিতে হয়। অতএব আমাদিগের সৎপ্রবৃত্তি সকলেরই সমধিক আলোচনা করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে অসৎপ্রবৃত্তিগুলির চর্চ্চার নিমিত্ত আর অধিক সময় থাকিবে না।

৪র্থ—বৃদ্ধকাল।

পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া সমস্ত দিন প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করত দিনমণি যেমন সায়ংকালে পশ্চিম দিকে অস্ত যান, আমরাও তদ্রূপ সুখের শৈশব ও বিষম যৌবনদশা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে আসিয়া উপনীত হই। এ সময় যৌবন-সুলভ চপলতা বা অবিবেকিতা কিছুই থাকে না; উৎসাহশক্তির হ্রাস হইয়া আসে, এবং অধ্যবসায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ভোগেচ্ছা আর পূর্ব্ববৎ থাকে না, এবং পরোপকারাদি হিতকর কার্য্যেও যত্ন কমিয়া যায়। এ দিকে শরীর বিশ্রী হইতে থাকে; চর্ম্ম লোল হইয়া পড়ে; মুখ দন্তহীন হওয়ায় কদাকার দেখায়; এবং কেশ সকল কাশপুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। পদদ্বয়ে চলৎশক্তি থাকে না, শরীরের বল কমিয়া আসে; এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ একে একে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ক্রমে নানা রোগ আসিয়া বৃদ্ধকে জীর্ণ করিয়া ফেলে।

সেই সংসার, সেই মনুষ্যসমাজ, সেই জগতের মোহিনী মায়া;—তথাপি জরাজীর্ণ ব্যক্তির অন্তরে আর সে সুখের আবির্ভাব নাই। তাঁহার মানসে কেবল অতীত সুখ-দুঃখের স্মৃতিমাত্র থাকে। সামান্য কথায় কথা নাই; সামান্য দুঃখে দুঃখ নাই; সামান্য সুখে সুখ নাই। এখন বিজ্ঞতা, প্রবীণতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বৃত্তি সকল তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক। অনন্ত চিন্তা—অসীম ভবিষ্যতের ভাবনা—তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর অধিকার করে। "মোহান্ধ হইয়া কত পাতক করিয়াছি, কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, কত অন্তরে যন্ত্রণা

দিয়াছি” ইত্যাদি ভয়ঙ্কর চিন্তা সকল তাঁহার জরাগ্রস্ত হৃদয়ে অহরহঃ উদিত হয়। পূর্ব্ববৎ প্রগাঢ় নিদ্রা আর নয়নে অধিষ্ঠান করে না। রজনীর বিশ্রাম-সুখ আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুভূত হয় না।

সংসারের কি অপূর্ব্ব মহিমা! ক্রীড়া-কৌতুকে শৈশব এবং নানা ইন্দ্রিয়সুখে যৌবন, অতীত করিয়া মানব কোথায় বার্দ্ধকে জগদীশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হইবে, তাহা না হইয়া দিবানিশি বিষয়-চিন্তাতেই ব্যাপৃত হয়। কোথায় পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের শেষভাগ নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিবে, তাহা না করিয়া ঘোরতর বিষয়-কর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত হয়। নিজ ভোগবাসনা ত ফুরাইয়াছে; তখন কিপ্রকারে সন্তান সন্ততির স্বচ্ছন্দ হইবে, কি উপায় করিয়া গেলে তাহারা বিনা পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, সেই সকল ভাবনাই অন্তরে নিরন্তর উঠিতে থাকে। কত শত নিঃসন্তান ব্যক্তির বুদ্ধির ভ্রমে, জগতের যে সকল উপকার তাহাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারিত, সেগুলির কিছুই হইতেছে না। বংশলোপভয়ে ভীত হইয়া পোষ্য পুত্রে বিপুল ঐশ্বর্য্য অর্পণ করত কত ধনবান্ ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন। সেই অর্থ জগতের কোন হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া গেলে, বোধ হয়, তাঁহাদিগের কীর্ত্তি সর্ব্বগ্রাসী কাল কখন বিলুপ্ত করিতে পারিত না।

অতিবার্দ্ধক্যে অনেকের মতিভ্রম জন্মে; স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয়; এবং হিতাহিত জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। কেহ কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বভাব হইয়া উঠেন; কেহ বা পুত্রপৌত্রাদির যথেষ্ট

কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ান। বৃদ্ধগণের অনেক দোষ ক্ষন্তব্য; বৃদ্ধের সকল অপরাধ ধরা যুবকের উচিত নহে। যুবকের নিরন্তর মনে করা কর্ত্তব্য যে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখার ন্যায় প্রাচীনের বুদ্ধি ক্ষণে উজ্জ্বল ও ক্ষণে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার সকল উপদেশ বা আজ্ঞা যে যুক্তি-সঙ্গত হইবে, তাহা আশা করা যায় না। ঈদৃশ অবস্থাকে এ দেশে "ভীমরথী" কহিয়া থাকে।

৫ম—মৃত্যুকাল।

মৃত্যুকাল অতিশয় ভয়ঙ্কর। জগতের কোনও প্রাণী এই করাল কালের কবল হইতে নিস্তার পায় না; সকলকেই কোন না কোন দিন এই ভীষণ কালে গ্রাস করিবে। মৃত্যুকালের আকার অতিভয়ানক। শরীর বিবর্ণ ও অবসন্ন; ধমনী সকলে শোণিতের চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া আসে; নয়নে দৃষ্টি চলে না; শ্রবণে শব্দ অনুভূত হয় না; চিরপরিচিত বান্ধবগণকেও চিনিতে কষ্টবোধ হয়। সম্মুখে আত্মীয় স্বজনগণ নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট; সকলের দৃষ্টিই মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখমণ্ডলে নিপতিত; সকলের লোচনই অশ্রুজলে ভাসমান; কাহারও মুখে কথা সরে না; সকলেই নীরব ও চিন্তায়মান। বাটীর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনিতে দর্শক-গণের ত কথাই নাই, মুমূর্ষু ব্যক্তিরও অন্তর বিদীর্ণ হয়, এবং

কখন কখন চক্ষুর প্রান্তভাগে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকেই লোকে মায়াকান্না কহে।

মৃত্যুকাল মুমূর্ষু ও দর্শক উভয় পক্ষকেই জ্ঞান প্রদান করে। মুমূর্ষু ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া যে কিরূপ ভাবনায় ব্যাকুল হয়, তাহা আর কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। তখন তাহার অতীত জীবনকালের যাবতীয় ব্যাপার স্মৃতি-পথে পতিত হয়. এবং পূর্ব্বকৃত সৎ ও অসৎ কার্য্যের ফলস্বরূপ আনন্দ ও অনুতাপ অন্তঃকরণে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সময় এক অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানের আবির্ভাব হয়; তখন ইচ্ছা হয়, যেন তাদৃশ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পুনরায় জীবন-পথের প্রথম হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করি এবং অতীত জীবনে বুদ্ধিভ্রম হেতু যে সকল পাপ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা হইতে অনেক দূরে থাকি। আবার যখন মনে হয়. আমি কোথায় চলিলাম, এ জগৎ আর দেখিতে পাইব না, এই প্রচুর ঐশ্বর্য্য আর ভোগ করিতে পাইব না, এই সকল সন্তান সন্ততি আর আমার বলিয়া মনে করিতে পাইব না; তখন অসহ্য শোক আসিয়া হৃদয়কে নিতান্ত ব্যথিত করে, এবং নেত্রে অশ্রুবিন্দু আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন এক দিকে শরীরের যাতনা, অন্য দিকে অন্তরের বেদনা। মুমূর্ষু ব্যক্তির দর্শকগণেরও মনে অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। তাহারা তখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় "সংসার অসার"। তৎকালে তাহাদের চিত্ত ক্ষণকালের জন্য এই বিনশ্বর সংসারের কার্য্যে উদাসীন হয়; কিছুই ভাল লাগে না; এবং তাহারা জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমা ও দুর্বোধ সৃষ্টিকৌশল ভাবিতে থাকে। তখন তাহাদের দৃঢ়

সঙ্কল্প হয়,—আর অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না, এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চলিব। কিন্তু বিশ্বমায়ার কি অপূর্ব্ব প্রভাব! মুমূর্ষু ব্যক্তি সম্মুখ হইতে অন্তরিত হইলেই, সেই সঙ্কল্পও তৎসঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্হিত হয়।

আমরা কখন চিরকাল বাঁচিব না, অবশ্যই মরিতে হইবে, এরূপ ভাবনা মনে জাগরূক থাকার অনেক ফল। মৃত্যুভয় ভুলিয়া গেলে মানব অতি ভীষণ দুষ্কর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিত হয় না; দুর্বলের উপর উৎপীড়ন করিতেও ভীত হয় না। এই কারণে কোন পূর্ব্বকালীন নরপতি একজন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রভাতে রাজার নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিত "মহারাজ! আপনাকে মরিতে হইবে।" ভূপতি সমস্ত দিন সেই কথা স্মরণ রাখিয়া রাজকীয় কার্য্য করিতেন, এবং সেই বাক্য স্মরণ থাকাতেই কোনরূপ প্রজা-পীড়ন করিতে ইচ্ছুক হইতেন না। যদিও বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জনকালে আপনাকে অজর ও অমরের ন্যায় মনে করিয়া কার্য্য করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রের বিধান আছে, তথাপি লৌকিক ব্যবহারে তাদৃশ আচরণ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে।

৬ষ্ঠ—প্রাতঃকাল।

প্রভাত-সময় অতি রমণীয়। এখন সমস্ত জগৎ শীতল। প্রকৃতি জাগরিত হইয়া অভিনব শোভায় ভাসমান হয়। পুষ্প-

ভরে অবনত লতা সকল প্রভাত-পবনে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া মানবের মনোহরণ করে। মন্দগতি প্রভাত-বায়ু সুগন্ধি কুসুম সকলের সৌরভ বহন করিয়া দেশে দেশে বিকীর্ণ করিতে থাকে।

এক্ষণে সমস্ত সংসার জাগরিত;—বৃক্ষশাখায় নানাবিধ পক্ষিগণ জাগরিত; কাননে নানা বনজন্তু জাগরিত; জলে জল-জন্তু জাগরিত; স্থলে মনুষ্যগণ জাগরিত; এবং সর্ব্বত্র কীট-পতঙ্গাদি যাবতীয় জীবগণ সকলেই জাগরিত। গোষ্ঠে গো সকল জাগরিত হইয়া ক্ষেত্রে চরিতে যায়; পল্লীতে কৃষকদল জাগরিত হইয়া হলচালন প্রভৃতি ক্ষেত্রকর্ম্মে নিযুক্ত হয়; গ্রামে বালকগণ পাঠে নিরত, এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত, হয়।

এ সময় পূর্ব্ব দিকের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোহিতবর্ণ দিবাকরের নবীন আতপে পূর্ব্ব দিকের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অত্যুন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ অথবা অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকলের অগ্র-ভাগ সৌবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত প্রতীয়মান হয়। গগনে মেঘমালা আরক্তিম বর্ণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ক্রমে আতপ ভূতলে অবতীর্ণ হয়। যে স্থান অন্ধকারময় ছিল, সে স্থান রবি-কিরণে উজ্জ্বল দেখায়; বোধ হয় যেন, ধরাতল নীল বস্ত্র পরি-ত্যাগ করিয়া পীত বসনে আবৃত হয়।

প্রাতঃকালে মানবগণের চিত্ত প্রশান্ত থাকে। কারণ, রাত্রিকালের নিদ্রা মনুষ্যদিগের পূর্ব্ব দিনের শ্রান্তি দূর করে। নিদ্রার অবসানে অন্তঃকরণ যেন নূতন হইয়া পুনরায় স্বকার্য্যে নিযুক্ত হয়। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীবগণ যথার্থ প্রকৃতির

নিয়মে চলে; প্রভাত-বায়ু শরীরে লাগিলে তাহারা আর নিদ্রিত থাকিতে পারে না। কিন্তু নগরের অনেক লোক এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হন, এবং নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রাতঃকালের সূর্য্য কথনই দেখিতে পান নাই। কি আশ্চর্য্য! প্রাতঃকালে উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে যে কি আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারা জানেন না। প্রভাতকালের ভ্রমণ অতিশয় স্বাস্থ্যকর।

৭ম—মধ্যাহ্নকাল।

আমাদিগের দেশে মধ্যাহ্নসময় কার্য্যকরণের উপযুক্ত নহে; এজন্য বহুকালাবধি এ দেশে সকাল ও বিকালে কার্য্য করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় বালকগণ দিবসে দুইবার গমন করে; রাজাদিগের সভা মধ্যাহ্নসময়ে ভঙ্গ হয়; জমীদারদিগের কাছারী প্রাতঃকালে ও বিকালে বসে; হাট বাজার মধ্যাহ্ন-কালে প্রায় শূন্য থাকে; এবং শ্রমজীবিগণ সকাল ও বিকালে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইংরেজ-রাজ্যে এ নিয়মের বৈপরীত্য ঘটিয়াছে; এখন প্রাতঃ-কাল ও সায়ংকালে না হইয়া সচরাচর বেলা ৯।১০টার সময় কার্য্য আরম্ভ হয় এবং বেলা ৫।৬টার সময় পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে।

এই নিয়মে অনেক স্থলে অনেক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়; ১মতঃ, কার্য্যস্থানে দিনে দুইবার যাইবার কষ্ট পাইতে হয় না; বিশেষতঃ যাঁহারা দূরদেশবাসী, তাঁহারা নৌকায় অথবা রেলের গাড়ীতে কখনই দুইবার গমনাগমন করিতে পারেন না। ২য়তঃ, শীত গ্রীষ্ম সমস্ত ঋতুতেই এই নিয়ম ঠিক্ থাকিতে পারে। ৩য়তঃ, লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা হইবার অধিক সম্ভাবনা, যেহেতু প্রত্যহ আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে। অতএব এই নিয়ম সকল ঋতুতেই ভাল, কেবল গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে ভাল নহে। তখন প্রাতঃকালই কার্য্য করিবার উপযুক্ত সময়। এজন্য গ্রীষ্মকালে অনেক স্থানে প্রভাতেই কার্য্য চলিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন কি ভয়ানক! তখন দিবাকর ঠিক্ মস্তকের উপরি প্রচণ্ড কিরণ বিকীর্ণ করেন। রবির উত্তাপে সন্তপ্ত হইয়া বায়ু যেন অগ্নিকণা বর্ষণ করে; এবং গৃহের বাহিরে গমন করা অতি কষ্টদায়ক ব্যাপার হইয়া উঠে। এই সময় বনবাসী জীবগণ ক্লান্ত হইয়া শীতল বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করে। পরিশ্রান্ত পক্ষিগণ নিবিড় পত্রে আবৃত শাখায় বিশ্রাম-সুখ অনুভব করে। আতপক্লান্ত পথিকগণ তরুতলে উপবেশন করিয়া পথিশ্রম অপনয়ন করিয়া থাকে। জলাশয়ের জন্তুগণ উপরিভাগের অত্যুষ্ণ জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া গভীর জলে মগ্ন হইয়া রহে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হরিণগণ জলভ্রমে মরীচিকার অনুসরণে ধাবমান হয়। নিষ্কর্ম্মা মানবগণ আহারান্তে নিদ্রাসুখ অনুভব করে। পথে লোকসমাগম অল্প হইয়া আসে। এ সময় অনবরত ঘর্ম্মবিন্দু বিগলিত হওয়াতে শরীর ক্ষীণ হয়। নিরন্তর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলাতে হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়।

সর্ব্বদা ব্যজন-সেবনই ভাল লাগে। ধনিগণের ভবনে বরফ-মিশ্রিত জল ও টানা পাখা এই সময়ের প্রধান সামগ্রী। রৌদ্রতাপে কোন কোন জীব রসনা বহির্গত করিয়া হাঁপাইতে থাকে। গাভীগণ ক্ষেত্রমধ্যে কোন বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে।

এই ভয়ঙ্কর সময়ে মরুভূমি-মধ্যে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহী আরবীয়দিগের কি দুর্দ্দশা! উপরে প্রচণ্ড সূর্য্য, নিম্নে অগ্নিকণাবৎ প্রতপ্ত বালুকা, এবং চতুষ্পার্শ্বে অত্যুষ্ণ বায়ু যেন অগ্নিশিখা বর্ষণ করে। তাহাতে আবার তথায় বিন্দুমাত্র জল নাই, এবং কোন আশ্রয়স্থলও নাই; পিপাসায় বক্ষঃস্থল শুষ্ক হইয়া যায়। সে সময় উষ্ট্রই একমাত্র সহায়; উষ্ট্র বহুদূর হইতে কোন্ দিকে জলাশয় আছে তাহা টের পায়, এবং সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকে। আরবীয়েরা ঈদৃশ কষ্ট সহ্য করিয়াও বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

৮ম—সায়ংকাল।

সায়ংকাল অতি মনোহর। দিবাকর, দুরাচার ভূপতির ন্যায় সমস্ত দিন নিখিল ভূমণ্ডল কর-পীড়িত করিয়া এক্ষণে পশ্চিম দিকে অস্তগমন করেন; অদৃশ্য হইয়াও ক্ষণকাল নিজ প্রতাপরূপ আরক্তিম আতপ রাখিয়া যান। অত্যাচারী ব্যক্তি অন্তিম কালেও দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে না। কিন্তু নিয়তি

কে খণ্ডন করিতে পারে? ঈদৃশ সহস্র কর সহায় থাকিতেও প্রবল-প্রতাপ দিবাকর সাগরজলে নিপতিত হইয়া বিলীন হন। দুরাত্মা নরপতি অথবা ভূস্বামী, সূর্য্যের এই দুরবস্থা দেখিয়া, আপনাদিগের পরিণাম বুঝিয়া লইবেন।

ক্রমে আকাশমণ্ডল লোহিত বর্ণ ত্যাগ করিয়া মলিন হইতে আরম্ভ হয়; বিরল অন্ধকার আসিয়া দিনকরের অধিকার আক্রমণ করে। আকাশের স্থানে স্থানে দুই একটী তারা নয়নগোচর হয়। রৌদ্র-তপ্ত বায়ু ক্রমে শীতল হইয়া আসে। পক্ষিগণ বৃক্ষশাখাস্থিত নিজ নিজ নীড়ে আসিয়া বসে; মৃগ প্রভৃতি প্রাণিগণ বনমধ্যস্থ ভয়শূন্য প্রদেশে গিয়া শয়ন করে। পেচক, বাদুড়, শৃগাল প্রভৃতি রাত্রিচর জীবগণের পরম আনন্দের সময় উপস্থিত হয়; জোনাকিপ্রভৃতি নিশাচর পতঙ্গ সকল চারিদিকে বিচরণ করিয়া বেড়ায়; ভূমিতলে উচ্চিঙ্গড়া প্রভৃতির কর্কশ শব্দে কর্ণ বধির হইতে থাকে; এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগের ভয়ঙ্কর শব্দে বনের নিকটবাসী মনুষ্য-দিগের হৃদয় কম্পিত হয়।

এই সময় লোকালয়ে মহাগোল; গ্রামে একপ্রকার, নগরে অন্যপ্রকার। গ্রামে—গাভীগণ প্রান্তর হইতে ফিরিয়া আসে; যাহাদিগের বৎস গৃহে বদ্ধ থাকে, তাহাদিগের গতি অতি সত্বর; কৃষকগণ ক্ষেত্র হইতে ক্লান্তদেহে নিজ নিজ গৃহের অভিমুখে আসিতে থাকে; রমণীগণ জলাশয় হইতে জলপূর্ণ কলস কক্ষে করিয়া শীঘ্র বাটীতে আসেন। হাটের পথে লোক-সমাগম অধিক; কেহ গীত গায়; কেহ কি ভাবিতে ভাবিতে ক্রীত দ্রব্য হস্তে করিয়া চলিয়া যায়। শীত ও গ্রীষ্মের সন্ধ্যা-

কালে পথে শকটের সত্বর পরিচালনে ধূলি উত্থিত হইয়া গগন অন্ধকারময় করে। গ্রামের প্রতিগৃহে প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, সর্ব্বত্র শঙ্খ বাজিয়া উঠে, এবং কোথাও দেবালয়ের শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি দূর হইতে শুনা যাইতে থাকে। কোন স্থানে বাটীর কর্ত্তা গৃহে আসিয়া ভৃত্যকে পাদ ধৌত করিবার জন্য জল আনিতে আদেশ করেন; কোথাও বা গৃহিণীগণ বালক-দিগকে নিদ্রালু দেখিয়া, তাহাদিগকে শয্যায় শয়ন করাইয়া থাকেন।

এদিকে নগরে মহাধূমধাম; রাজপথে ভারবাহী শকট সকল দ্রুতগতিতে গমন করে; নগরপ্রান্তরে ধনবান্ নাগরি-কেরা অত্যুৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া অপরাহ্ণ-শীতল বায়ু সেবন করিতে যান; নানাবিধ কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারিগণ, কেহ শকটে কেহ পদব্রজে চলিয়া, বাটীতে আগমন করেন। প্রতি-পথে—প্রতিভবনে—আলোকমালা জ্বলিয়া উঠে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত শ্রমজীবিগণ এখন মনের উল্লাসে সঙ্গীত করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসে। এ সময়, কোন মন্দিরে উপাসনা, কোন স্থানে সঙ্গীত, কোথাও বা গ্রন্থপাঠ হইতে থাকে। ফলতঃ, কি গ্রাম কি নগর এক্ষণে সমস্ত স্থানই ব্যস্ত; সকল প্রাণীই স্ব স্ব আবাসে যাইতে ব্যগ্র, এবং প্রায় সকলেই পরিশ্রান্ত।

৯ম—রাত্রিকাল।

রজনী জীবলোকের বিশ্রাম-সময়। দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি প্রাণিগণ দিবাভাগে আহার অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত থাকে, এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ-হেতু শ্রান্ত হইয়া সায়ংকালে স্ব স্ব বাসস্থানে যেমন আগমন করে, অমনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। কতকগুলি জন্তুর এরূপ নিয়ম নহে, তাহারা দিবসে বিশ্রাম করিয়া রাত্রিকালে বিচরণ করে; তাহাদিগকে রাত্রিচর বা নিশাচর কহিয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যেও কতকগুলি নিশাচর আছে; যেমন তস্কর, ডাকাইত ইত্যাদি। তাহারা অন্ধকার-রাত্রিতে গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করে।

রাত্রি নিদ্রার উপযুক্ত কাল। এই সময় দিবাভাগের উত্তাপের ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে বলিয়া পৃথিবী শীতলভাব ধারণ করে; এবং দিবসের পরিশ্রম যেন নিদ্রাকে আহ্বান করিয়া আনে। রাত্রিচর ভিন্ন সকল প্রাণীই এই নিয়মের অধীন; পল্লীগ্রামের কৃষক প্রভৃতি অনেক লোকও এই নিয়মে চলে; কিন্তু নগরের অনেকেই ইহার বিপরীত আচরণ করেন।

"সকাল সকালে নিদ্রা, প্রত্যূষে উত্থান;
যে করে, সে হয় সুস্থ, বিজ্ঞ, ধনবান্"—

মহাত্মা বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ এই উপদেশ-বাক্যটী প্রকৃতি হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির নিয়মাধীন হইয়া চলিলে সকল জীবেরই শরীর সদা সুস্থ থাকে। শরীর-স্বাস্থ্যের অনেক ফল; শরীর ও অন্তঃকরণের এরূপ সংযোগ যে, শরীর অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হয়; এবং শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ

থাকে। সুস্থশরীর ব্যক্তি উপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া ধন উপার্জ্জন ও নানাপ্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিনের উপদেশবাক্যটী নগরের অতি অল্প ব্যক্তিই প্রতিপালন করিয়া থাকেন। অনেকে অতিকষ্টে নিদ্রা জয় করিয়া নিশীথ-সময়ের অধিক কালই পাঠে অতিবাহিত করেন। কেহ কেহ বা সংসর্গদোষে পড়িয়া সঙ্গীতাদি আমোদে সমস্ত রাত্রি বৃথা জাগরণপূর্ব্বক প্রভাতে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হন।

শেষরাত্রি গভীর চিন্তার প্রকৃত সময়; তখন মন সুস্থির ও প্রফুল্ল থাকে; শরীরের কিছুমাত্র গ্লানি থাকে না; এবং নির্জনতা হেতু চিন্তার কোন ব্যাঘাতও ঘটে না। যাঁহাদিগের শরীর-চালনা অপেক্ষা বুদ্ধি-চালনা অধিক করিতে হয়, তাঁহারা রাত্রির শেষভাগ কেবল চিন্তাতেই অতিবাহিত করেন। এই সময় স্মৃতিশক্তিও প্রবল হয়। শুনা গিয়াছে, কেহ কেহ সমস্ত দিবস ভাবিয়াও যে বিষয় স্থির করিতে পারেন নাই, যামিনীর শেষ ভাগে সেই বিষয় তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে সহসা উদিত হয়।

১০ম—ঋতু।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

আমরা বৎসরে ছয় ঋতু বলিয়া থাকি; কিন্তু গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিন ঋতুই প্রবলরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। বর্ষা

ও শীতের মধ্যে আর দুইটী ঋতুর আবির্ভাব হয়; প্রথম শরৎ, দ্বিতীয় হেমন্ত। এবং শীতকালের অবসান ও গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভ এই উভয়ের মধ্যস্থিত কালের নাম বসন্ত ঋতু বলা যায়। কিন্তু ইংরেজদিগের দেশে চারিটীমাত্র ঋতু অনুভূত হয়। যথা—বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত। তথায় রাত্রি চিরকালই হিমেতে আচ্ছন্ন, সুতরাং তাঁহারা হেমন্তকে একটী স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া গণ্য করেন না। আর এ দেশের ন্যায় তাঁহাদিগের দেশে বর্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; সুতরাং তথায় বর্ষা একটী স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ অন্যান্য দেশেও ঋতু-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর বা সর্ব্বদক্ষিণ প্রদেশে শীত ও বসন্ত এই দুইটীমাত্র ঋতুর অনুভব হয়; পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুই প্রধানরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। তথায় দিবসে যেরূপ প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, রাত্রিতেও তদ্রূপ ভয়ঙ্কর শীত। বৎসরের মধ্যে একবিন্দুও বৃষ্টি পড়ে না, আফ্রিকায় এমন স্থলও আছে।

যাহা হউক, আমাদিগের দেশে যে ছয় ঋতু বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, তাহাই বর্ণনা করা এই রচনার উদ্দেশ্য।

১ম, গ্রীষ্ম। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। সকল ঋতু অপেক্ষা এই ঋতু অতি ভয়ানক ও কষ্টদায়ক। এ সময় সূর্য্যের কিরণ অত্যন্ত প্রচণ্ড হয়; এমন কি, মধ্যাহ্নসময়ে বাটীর বাহিরে গেলে মৃতপ্রায় হইতে হয়। এই কালে দিবাভাগ দীর্ঘ ও রাত্রির পরিমাণ কম হইয়া আসে। গ্রীষ্মপ্রযুক্ত রজনীতে ভালরূপ নিদ্রা হয় না, তজ্জন্য বিসূচিকা (ওলাউঠা) প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রোগ আবির্ভূত হয়। এই কালে অনবরত ঘর্ম্ম

বিগলিত হওয়াতে দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সময়ের সায়ংকালই রমণীয়। সুখের মধ্যে—এই কালে আম, কাঁটাল, জাম, নিচু, গোলাবজাম প্রভৃতি নানাবিধ সুখাদ্য ফল উৎপন্ন হয়।

২য়, বর্ষা। আষাঢ় ও শ্রাবণ—এই দুই মাস বর্ষাকাল। এই কালে আকাশ প্রায় মেঘাচ্ছন্ন থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড়, জল ও বজ্রপাত হয়। এই ঋতুর দুই এক দিন এরূপ প্রচণ্ড গ্রীষ্ম অনুভূত হয় যে, তদ্রূপ উত্তাপ গ্রীষ্মকালেও হয় কি না সন্দেহ। আষাঢ় অপেক্ষা শ্রাবণেই প্রায় অধিক বর্ষণ হয়, [কোন কোন বৎসর ভাদ্র মাসেই অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে,] এবং সেই সময়েই কৃষকেরা ক্ষেত্রে ধান্যরোপণ করে। আমাদিগের দেশে ধান্যই জীবন-ধারণের প্রধান উপায়; যে বৎসর উপযুক্ত সময়ে জল না হওয়াতে প্রয়োজনীয় ধান্য উৎপন্ন হয় না, সেই বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। ইহা বিবেচনা করিলে বর্ষাই আমাদের দেশের প্রধান ঋতু বলিয়া ধরিতে হয়। সমুদয় দেবমাতৃক* দেশেই এইরূপ। কিন্তু নদীমাতৃক* দেশের লোকেরা বর্ষার তত অপেক্ষা করে না।

৩য়, শরৎ। ভাদ্র ও আশ্বিন—শরৎ; বস্তুতঃ বর্ষার শেষ ভাগকেই শরৎ কহিয়া থাকে। এ সময় আকাশ কখন কখন শ্বেতবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হয়; বর্ষার প্রথমাবস্থার ন্যায় অনবরত বর্ষণ বা বজ্রপাত থাকে না। মধ্যে মধ্যে গগনে বিচিত্রবর্ণ

* দেবমাতৃক—যে দেশে বৃষ্টির জলেই শস্য জন্মে।
নদীমাতৃক—যে দেশে নদীর জলেই শস্য উৎপন্ন হয়।

ইন্দ্রধনু দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন মেঘের গম্ভীর গর্জনও শ্রুতিগোচর হয়। এ সময় গ্রীষ্মেরও প্রচণ্ড প্রতাপ থাকে না, এবং শীতেরও তাদৃশ তীক্ষ্ণতা উৎপন্ন হয় না। এইজন্য শরৎ আমাদের দেশে অতি রমণীয় সময়। এই সময়ে ক্ষেত্রের শোভা অতি মনোহর হয়; হরিদ্বর্ণ শস্য সকল মন্দ বায়ুতে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া কৃষকের আশা বর্দ্ধিত করে। এই কালে জলে ও স্থলে নানাজাতীয় কুসুম বিকসিত হয়।

৪র্থ, হেমন্ত। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—এই দুই মাস হেমন্ত কাল। এই সময়ে সায়ংকাল হইতেই হিম পড়িতে আরম্ভ হয় এবং সমস্ত রাত্রি যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যত দিন যায়, ততই ক্রমশঃ ঈষৎ শীতের অনুভব হয়। এই কালের হিম শরীরে লাগিলে কফ, কাসী, জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মে। এইজন্য লোকে শীত-বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এ সময় কৃষকগণের স্নানাহারের অবকাশ থাকে না, সমস্ত দিনই ক্ষেত্রে ধান্য কাটিতে ব্যস্ত থাকে, এবং ঐ ধান্যগুলি আটি বাঁধিয়া আনিয়া নিজ বাটীর উঠানে রাশীকৃত করিয়া রাখে; পরে অবসরক্রমে সেই আটি সকল আছড়াইয়া খড় হইতে ধান্য পৃথক্ করিয়া লয়। এই হৈমন্তিক শস্যে নানাদেশীয় লোক প্রতিপালিত; কিন্তু কিরূপ পরিশ্রমে ইহা উৎপন্ন হয়, তাহা কৃষকেরাই জানে।

৫ম, শীত। পৌষ ও মাঘ—এই দুই মাস শীত ঋতু বলিয়া গণনা করা যায়, কিন্তু ফাল্গুন মাসেও শীতের কিয়দংশ থাকে। শীত কালের রাত্রি অনেক বড়, দিনমান অতি অল্প। এই কালে সমস্ত জগতের লোক কার্য্যে ব্যস্ত;—গ্রামে কৃষকগণ

ধান্য লইয়া ব্যস্ত; ভূস্বামীর কর্ম্মচারীরা করসংগ্রহে ব্যস্ত; এবং কাননে কাষ্ঠচ্ছেদকেরা কাষ্ঠ-সংগ্রহে ব্যস্ত। নদ নদী ও মহাসাগরে বণিক্‌গণ বাণিজ্যদ্রব্যে জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া দেশ-দেশান্তর-গমনে ব্যতিব্যস্ত; এবং নানাজাতীয় ব্যবসায়ী লোক স্বস্বপণ্যবিক্রয়ে সদা শশব্যস্ত। এই সময়ে দাড়িম, পেস্তা, কমলালেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও কপি, কড়াইসুটি প্রভৃতি দ্রব্য যথেষ্ট জন্মে।

ষষ্ঠ, বসন্ত। ফাল্গুন ও চৈত্র—এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। ইহা শীত ও গ্রীষ্মের মিলন-সময়, এজন্য শরৎ অপেক্ষাও ইহা রমণীয়। এ সময় তরু ও লতা সকলের নূতন পত্র ও মঞ্জরী বহির্গত হওয়াতে, জগতের অপূর্ব্ব শোভা হয়, এবং নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত করে। এই কালে কোকিলের কণ্ঠস্বর মধুর লাগে। জীব-মাত্রেরই শরীর সুন্দর ও হৃদয় প্রফুল্ল হয়। কিন্তু কখন কখন বসন্ত রোগের আবির্ভাব হেতু প্রাণিগণের কষ্ট হইয়া থাকে।

[উপরি উক্ত ছয় ঋতু বঙ্গদেশে যেরূপ ঘটে, তাহাই লিখিত হইল। পশ্চিম অঞ্চলে ইহার কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্মকাল, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষাকাল, ইত্যাদিরূপে ঋতু সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, বঙ্গদেশে যখন গ্রীষ্ম আরম্ভ হয়, তখনও তথায় অল্প শীত থাকে। এইরূপ অন্যান্য ঋতুরও প্রভেদ দেখা যায়।]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুণ ও ক্রিয়া বিষয়ক রচনা।

১ম—পিতা মাতার প্রতি ব্যবহার।

আমরা যে জনক জননী হইতে এই জগতে জন্ম লাভ করিয়াছি, যাঁহারা আমাদিগের লালন-পালনার্থ কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, ও কত বিপদ্ সহ্য করিয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের বিন্দু-মাত্র অযত্নে আমাদিগের জীবন-নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, তাঁহারা যে আমাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আরাধনার পাত্র, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদিগকে মহাগুরু কহিয়া থাকে; কারণ, তাঁহাদিগের অপেক্ষা গুরুতর ব্যক্তি এ জগতে আর নাই। তাঁহাদিগের ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা কথনই সম্ভব নহে। কিন্তু অসম্ভব বলিয়া একেবারে বিমুখ থাকাও উচিত নয়। যতই করিতে পারা যায়, ততই কৃতজ্ঞতার কার্য্য করা হয়। অতএব তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত আমাদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

আমাদিগের জনক জননীর উপর আমাদিগের অন্তঃকরণ ও শরীর পরিপোষণ করিবার ভার বিন্যস্ত হইয়াছে। পিতা সন্তানগণকে শিক্ষিত, বিনীত ও সচ্চরিত্র করিতে চেষ্টা করেন; সন্তান জনসমাজে মান্য, গণ্য ও যশস্বী হইলে, তিনি আপ-

নাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করেন। পুত্রের সুখ্যাতি লোকমুখে শ্রবণ করিলে, তিনি আনন্দ-সাগরে ভাসমান হন। সন্তান বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র হওয়া পিতা মাতার অনেক পুণ্যের ফল। যাঁহাদের ভাগ্যে তাদৃশ সন্তান ঘটে, তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা! ইহারই প্রভাবে, পুত্র বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে, পিতা পরম সুখের বিষয় মনে করেন।

জনকের ন্যায় পরম স্নেহময়ী জননীও নিজ তনয়কে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিরূপে সন্তানের শরীর সুস্থ থাকিবে, সেই চিন্তাই তাঁহার চিত্তে নিরন্তর উদিত হয়। সন্তান-পালনে তাঁহাকে যে কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা কে না দেখিতে পায়। কিন্তু স্নেহের বশে তিনি সেই যন্ত্রণাকে যন্ত্রণাই মনে করেন না। মাতা আমাদের দুঃখে দুঃখভাগিনী, সুখে সুখভাগিনী এবং রুগ্নাবস্থায় স্বয়ং রোগীর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। রোগগ্রস্ত তনয়কে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আর কে এ জগতে সমস্ত যামিনী যাপন করিয়া থাকেন? অজাতদন্ত শিশুসন্তানের রমণীয় মুখে মধুর হাস্য সন্দর্শন করিয়া আর কাহার অন্তরে তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়? সন্তানের কল্যাণ-কামনায় আর কে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে কাতর হন না? এরূপ অপরিসীম স্নেহ ও এপ্রকার প্রগাঢ় প্রীতির আধার জননী ভিন্ন এ জগতে আর কেহই নাই।

যাঁহারা আমাদিগের জীবনদাতা, যাঁহারা আমাদিগের অনু-

ক্ষণ শুভাকাঙ্ক্ষী, যাঁহারা আমাদিগের জন্য এতাদৃশ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন, এবং আমরা যাঁহাদিগের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, সেই জনক জননীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। যাহাতে তাঁহাদের দুঃখ দূর হয় এবং সুখ স্বচ্ছন্দ বাড়িতে পারে, এরূপ কার্য্য সম্পাদন করাই সন্তানের কর্ত্তব্য। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের আজ্ঞাপালন ও অচলভক্তি-সহকারে তাঁহাদের সেবা করিতে পারিলে, আমাদিগের জীবন সার্থক হয়। হায়! এই পিতা মাতাকে কষ্টপ্রদান বা তাঁহাদের প্রতি প্রহার বা কটূক্তি-প্রয়োগ কি পাষণ্ডের কর্ম্ম! কি পামরের কার্য্য! কি কৃতঘ্নের ব্যবহার!

২য়—ভ্রাতৃ-ভগিনীর সদ্ভাব।

ভ্রাতৃবর্গ ও ভগিনীগণ এক জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা জন্মাবধি প্রায় একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন ও একত্র ক্রীড়া কৌতুক করে। সকলেই এক পিতা মাতার স্নেহ ও আদরের পাত্র। জনক ও জননী সকলকেই অপক্ষপাতে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে যে, ভাই ভগিনীরা পরস্পর স্নেহ ও সদ্ভাব প্রকাশ করিবে; যত কাল একত্র থাকিবে, তত কাল কেহ কাহারও সহিত কলহ বা বিরোধ

করিবে না; এবং সকলেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর যথোচিত সম্মান করিবে। এরূপ করিলে, পরিবারের মধ্যে চিরদিন সুখ ও সন্তোষ বিরাজমান থাকে; পিতা মাতা সন্তানগণের উপর সর্ব্বদা প্রীত ও সন্তুষ্টচিত্ত থাকেন; এবং লোকে দেখিয়া তাদৃশ পুত্র-কন্যাদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু যে পরিবারে ভাই-ভগিনী-গণ অহরহঃ বিবাদ ও কলহাদি করে, পরস্পর পরস্পরের সহিত ঈর্ষা ও বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে পিতা মাতার নিকটে একজন অন্যের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে, সে সংসারের কখনই মঙ্গল হয় না। তাদৃশ ভ্রাতৃ-ভগিনীরা সকলের অপ্রিয়, বিশেষতঃ পিতা মাতার বিশেষ কষ্টের কারণ হয়।

ভাই-ভগিনী-গণের মধ্যে সদ্ভাব থাকিলে, আর একটী মহৎ শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই তাহারা একতার সুখ ও উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারে। যেমন, এক এক গাছি রজ্জু একত্র মিলিত করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বদ্ধ করা যাইতে পারে, তদ্রূপ ভ্রাতৃ-ভগিনী-বর্গ পরস্পর সদ্ভাববিশিষ্ট হইলে সকলে মিলিয়া অনেকানেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে। একের অ-সাধ্য ব্যাপার অনেকের সহজ-সাধ্য। যে সৎকার্য্যটী এক ভ্রাতা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না, পরস্পর সদ্ভাবে থাকিলে অনেকে একত্র হইয়া সেটী অনায়াসে নিষ্পন্ন করিতে পারে। বাল্যাবধি এইরূপ সদ্ভাবসম্পন্ন পরিবারের মধ্যে থাকিয়া একতার উপকারিতা বুঝিতে পারিলে, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সামাজিক একতা স্থাপন করিতে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ

নাই। যে বালক নিজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত সদা কলহ ও কুব্যবহার করিয়া থাকে, সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অপরের সহিত তাদৃশ কুব্যবহার করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? যে বালিকা বাল্যাবধি দুর্ম্মুখ ও কলহপ্রিয় হয়, সে বিবাহের পর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের সহিত কদর্য্য ব্যবহার করিবে, তাহার কিছুই আশ্চর্য্য নহে। অতএব শৈশব হইতে সৌভ্রাত্র-রূপ পরম হিতকর অমূল্য ধন উপার্জ্জন করিতে যত্ন করা সকল ভাই-ভগিনীরই কর্ত্তব্য।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! এই অমূল্য রত্ন আমাদিগের দেশে অতিবিরল। "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই," এই নিন্দনীয় প্রবাদটী এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণের পৃথগ্‌ভাব ঘটিলেও যদি পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকে, তবে তাহা দূষণীয় নহে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ পৃথগ্‌ভাব আমাদিগের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবল বিরোধের পর ঘটিয়া থাকে। বিভাগের পর পরস্পরের এরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, বোধ হয় যেন তাহারা এক জননীর গর্ভে জন্মে নাই। কত স্থানে সহোদরবর্গের প্রবল অপ্রণয়ানল যাবজ্জীবন প্রজ্বলিত দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ অনলেই কত পরিবার একবারে ছারক্ষার হইয়া যাইতেছে, তাহাও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যাপার নিতান্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণার বিষয়।

৩য়—শিক্ষকের প্রতি ব্যবহার।

আমাদিগের পিতা মাতা, অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা, আমাদিগের শরীর বর্দ্ধিত ও ভূষিত করিয়া থাকেন; কিন্তু শিক্ষকগণ জ্ঞান-উপদেশ দ্বারা আমাদিগের মানসিক বৃত্তি সকল পরিপুষ্ট এবং অন্তঃকরণকে নানা গুণে অলঙ্কৃত করিয়া তুলেন। পিতা মাতা হইতে আমরা এই জগতে জন্ম লাভ করিয়া থাকি, কিন্তু শিক্ষক মহাশয়গণ হইতে আমরা জ্ঞান-চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়া সৎপথ দেখিতে পাই। সন্তান-পালনে পিতা মাতার স্বার্থলাভের সম্পূর্ণ অভিলাষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষক অনেক অংশে * স্বার্থের প্রয়াসী না হইয়া বিদ্যা দান করিয়া থাকেন। সন্তান কৃতবিদ্য হইলে পিতা মাতার যতদূর আনন্দ জন্মিয়া থাকে, একটী ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শিক্ষক মহাশয়ও তদ্রূপ প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব জন্মদাতা ও জ্ঞানদাতা উভয়ই সমান মাননীয় ও শ্রদ্ধার ভাজন, সন্দেহ নাই।

কিরূপ ব্যবহার করিলে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ পায়, তাহা ছাত্রগণের জানা অতি আবশ্যক। শিক্ষক মহাশয় যখন কোন বিষয় শিক্ষা দেন, তখন স্থির হইয়া মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করা উচিত; তিনি যখন কোন

* অনেক অংশে বলিবার তাৎপর্য্য এই—শিক্ষক কেবল ক্ষণিক সুখ্যাতি ও যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভরূপ স্বার্থসাধনেই যত্নবান্, পিতামাতার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের ভাগী নহেন।

সৎকার্য্য করিতে আদেশ করেন, তখনি তাহা সম্পাদন করা বিধেয়; তিনি কোন কর্ম্ম করিতে একবার বারণ করিলে, প্রাণান্তেও তাহা করা কর্ত্তব্য নয়; কোনরূপ দোষ দেখিয়া তিনি যখন কোনপ্রকার শাসন করেন, তখন বিরক্ত বা উদ্ধত না হইয়া অধোমুখে ঐ দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অনবরত অশিষ্ট আচরণ দ্বারা তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করা অতীব অন্যায়; তাঁহার সহিত বিদ্রূপ ও পরিহাস করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য; এবং তাঁহার অযথার্থ অপবাদ ঘোষণা করা মহাপাপ। শিক্ষক মহাশয়ের কোন দোষ থাকিলেও তাহা গোপন করাই সৎ ছাত্রের * কর্ত্তব্য। সচ্চরিত্র বালক-মাত্রেই সর্ব্বদা সৎ ব্যবহার দ্বারা শিক্ষক মহাশয়কে প্রীত করিয়া থাকে।

শিক্ষক অজ্ঞানান্ধকারে রত্নপ্রদীপস্বরূপ, এবং সংসার-সাগরে দিগ্দর্শন-যন্ত্র-সদৃশ। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালককে যে সকল হিত উপদেশ দান করেন, নিতান্ত জড়-বুদ্ধিকেও সেই সকল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু উর্ব্বর ও ঊষর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায়, পাত্রের গুণ ও দোষে জ্ঞানলাভের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য তিনি পক্ষপাতদোষে দূষণীয় হইতে পারেন না। যে বালক শিক্ষক-মহাশয়কে পক্ষপাতী মনে করে, সে নিজের নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ করিয়া থাকে। যে বালক অসাক্ষাতে সদাশয় শিক্ষককে নিন্দা ও তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য

---

* গুরুর দোষ গোপন করাকে ছত্র কহে; সেই ছত্র আছে যাহার এই অর্থে ছাত্র শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন আর পৃথিবীতে দেখা যায় না। সকল বস্তুরই গুণানুসারে মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। জ্ঞান অমূল্য বস্তু। সেই বস্তু শিক্ষকমহাশয় আমাদিগকে অকাতরে দান করিয়া থাকেন। আমাদিগের এমন কিছুই ধন নাই, যাহা দিয়া আমরা তাঁহার সেই শিক্ষাদানের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি। কেবল প্রগাঢ় ভক্তি ও কায়মনো-বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেই, সেই ঋণের আংশিক পরিশোধ হয় মাত্র।

৪র্থ—বিদ্যাশিক্ষা।

বিদ্যা অমূল্য ধন। এ ধন তস্করে অপহরণ করিতে পারে না, জ্ঞাতিবর্গেও ইহার ভাগ লইতে সমর্থ হয় না। এ ধনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে থাকে; যত ইচ্ছা ব্যয় করিলেও ক্ষয় হয় না। বিদ্যাধন যে কিরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে, বিদ্যা-হীন ব্যক্তির অবস্থা একবার দেখিলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। অরণ্য বা পর্ব্বতবাসী অসভ্য মূর্খ জাতি, আর অট্টালিকাস্থিত সুসভ্য শিক্ষিত নগরবাসী লোক, এ উভয়ের মধ্যে অসীম প্রভেদ দেখা যায়। বিদ্যাবলে সভ্যজাতীয়েরা সুখ সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নানাবিধ সুবিধা ও উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্ণবযান (জাহাজ), বাষ্পীয়যান (রেলওয়ে) ও ব্যোমযান (বেলুন) প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ

করিয়া লোকের জলে, স্থলে ও শূন্যে গমনাগমনের কত সুবিধা করিয়াছেন; অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, দিগ্দর্শন, তাপমান ও বায়ুমান প্রভৃতি নানাপ্রকার যন্ত্র প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কত দূর উন্নতি সাধন করিয়াছেন; বস্ত্র-যন্ত্র, গোধূম-যন্ত্র, তৈল-যন্ত্র, মুদ্রা-যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সংসারের কত দূর সুবিধা সম্পাদন করিয়াছেন; সেতু, সুরঙ্গ, খাল, প্রণালী প্রভৃতি নানা অদ্ভুত বিষয় নির্ম্মাণে কতই কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন; তাড়িত-বার্ত্তাবহ ও তাড়িত-শব্দবহ আবিষ্কার করিয়া বুদ্ধি ও বিদ্যার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান দ্বারা দিন দিন কত শত প্রাকৃতিক রহস্য আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু বিদ্যাহীন অসভ্য জাতিরা চিরকাল সমান দুরবস্থায় কালযাপন করিতেছে।

বিদ্যা মানব-চিত্তের ভূষণস্বরূপ। সৎক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় ইহা নানা সদ্গুণরূপ ফল প্রসব করে; জ্ঞানের জ্যোতি প্রদীপ্ত করে, বিবেচনাশক্তি পরিষ্কৃত করে, চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত করে, এবং মানসিক বৃত্তি সকল সতেজ করিয়া দেয়; এতদ্ভিন্ন বিনয়, শিষ্টতা, সরলতা প্রভৃতি নানাবিধ গুণ শিক্ষা দিয়া থাকে। কিরূপে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হয়, কিরূপে ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে হয়, কিরূপে সন্তান পালন ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হয়, কিরূপেই বা আত্মীয় বন্ধু ও অপর সাধারণের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা সমুদায়ই বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে সুন্দররূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না।

বিদ্যাশিক্ষার সুখও বিস্তর। বিদ্যাবলে আমরা যে সমস্ত

আশ্চর্য্য বিষয় জানিতে পারিতেছি, তৎসমুদায় একবার ভাবিয়া দেখিলে মন আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতে থাকে। কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নবিদ্যা, কি শিল্পবিদ্যা, সমস্তই অদ্ভুত-রসের আধার ও আনন্দ-সলিলের সাগর। বিদ্যা-হীন ব্যক্তি এ সুখ অনুভব করিতে পারে না। যিনি বিদ্যা-শিক্ষার মর্ম্ম বুঝেন না, তাঁহাকে এ অনির্ব্বচনীয় সুখ বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত কঠিন।

অর্থ উপার্জ্জন করাই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য নহে; এবং বিদ্যা শিক্ষা করিলেই যে অথ উপার্জ্জন করা যায়, এমনও নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কখনই দারিদ্র্যদশায় পতিত হইতেন না, এবং মূর্খ লোকেরাও প্রচুর অর্থের অধিকারী হইত না।

অতএব, কি ভদ্র, কি ইতর,—কি ধনী, কি নির্ধন,—কি বালক, কি বৃদ্ধ,—কি নর, কি নারী,—সকলেরই ঈদৃশ সুখ-দায়ক বিদ্যার অনুশীলন করা উচিত। বিদ্যাহীন ব্যক্তি ও পশু উভয়ই সমান। বিদ্যা বিনা জীবনধারণই বৃথা। কুসুমশূন্য উপবন, চন্দ্রহীন গগন এবং ভদ্রতা-রহিত আচরণ যেমন প্রায় কাহারও আদরণীয় হয় না, বিদ্যাহীন অন্তঃকরণও সেইরূপ সকলেরই নিকট হেয় হইয়া থাকে।

৫ম—আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা।

আলস্য মনুষ্যের অশেষবিধ দুঃখের কারণ। ইহা আমাদিগের উন্নতির প্রধান শত্রু। মনুষ্য যত কেন ধনবান্, যত কেন বিদ্বান্, ও যত কেন সহায়শালী হউন না, আলস্যশয্যায় শয়ন করিলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারেন না। সভ্যজাতিরা যে এতদূর উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার কারণ কেবল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও আলস্য-পরিহার। অলস লোকে কখন অভিলষিত কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং কোন সুখই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। অলস ব্যক্তির নিকট এক দণ্ড এক যুগ বলিয়া বোধ হয়; নিষ্কর্ম্মা অলস ব্যক্তি অতিকষ্টে কাল কাটাইয়া থাকে। নিয়ত অলস থাকিলে কেহ কখন বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে পারে না। রৌদ্রে উত্তপ্ত না হইলে ছায়া যেমন সুখময় বোধ হয় না, পিপাসার্ত্ত না হইলে জল যেমন মিষ্ট লাগে না, তদ্রূপ পরিশ্রম না করিলে বিশ্রাম সুখজনক জ্ঞান হয় না। আলস্যে নিরন্তর বিশ্রাম বলিয়াই নিতান্ত অসুখ।

প্রাকৃতিক নিয়ম ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলেও স্পষ্টই বোধ হয়, কোন জীবই অলস হইলে সুস্থশরীর থাকিতে পারে না। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি যাবতীয় জীবেই জগদীশ্বরের এই নিয়ম প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত না হইলে, কখন শরীরের স্বাস্থ্যলাভ হয় না। দেহের সহিত মনেরও এরূপ সম্বন্ধ যে, দেহ অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হইয়া উঠে, এবং মানসিক বৃত্তি

সকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পুষ্পের মধ্যস্থিত কীটের ন্যায় আলস্য মনুষ্য-চিত্তের সমস্ত সদ্বৃত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। অলস ব্যক্তির অন্তঃকরণে ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি বা সৎকার্য্যের ইচ্ছা উদিত হইলেও, তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠা তাহার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। আলস্য-দোষে উৎসাহ-শক্তি একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। উৎসাহহীন ব্যক্তি সকলেরই অনাদরের পাত্র। অনাদৃত ব্যক্তির জন্মই বৃথা।

আলস্য শ্রমজীবী লোকদিগের ঘৃণার বস্তু, মধ্যবিত্তদিগের কতক আদরের সামগ্রী, এবং কোন কোন ধনবানের পরমারাধ্য দেবতা। ইহা একবার শরীরে প্রবেশ করিতে পাইলে সহজে ছাড়িতে চায় না, আমাদিগের বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আলস্য একবার বদ্ধমূল হইলে, তাহা দূর করা বড় কঠিন। অতএব বাল্যকাল হইতেই আমাদিগের আলস্যশূন্য ও শ্রমশীল হওয়া কর্ত্তব্য। আলস্যে বিদ্যালাভ হয় না। বাল্যকালে যে বালক বিদ্যাশিক্ষায় যে পরিমাণে আলস্য করে, উত্তরকালে তাহাকে সেই পরিমাণে ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু আলস্য পরিত্যাগ করিলে, এ সংসারে ধনী, মানী ও যশস্বী হইয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়।

আলস্যবশতঃ কোন আবশ্যক কর্ম্ম করিতে বিলম্ব করিলে, অথবা যে কর্ম্ম অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় তাহা করিতে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিলে, দীর্ঘসূত্রিতা প্রকাশ হয়। দীর্ঘসূত্রিতা একটী মহৎ দোষ। দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তিরা কোন কর্ম্ম কখন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না। যে কার্য্য করিতে মনস্থ করা যায়, তাহা ত্বরায় সম্পন্ন করা

উচিত। বিলম্ব করিলে কার্য্যহানি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিলক্ষণ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, সত্য, কিন্তু যখন ঐ কার্য্য একবার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা যায়, তখন উহা আরম্ভ করিতে বিলম্ব করিলেই দীর্ঘসূত্রিতা প্রকাশ পায়। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহা সম্পন্ন না করাও দীর্ঘসূত্রীর কর্ম্ম।

৬ষ্ঠ—পরিশ্রম।

পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবেরই কিছু না কিছু পরিশ্রম আবশ্যক। পরিশ্রম ব্যতিরেকে শরীর সুস্থ থাকে না, জীবিকা-নির্ব্বাহও হয় না। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণ সর্ব্বদাই নিজ নিজ আহার অন্বেষণে বেড়াইতেছে এবং অনেক পরিশ্রমে খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করিতেছে। হিংস্র পশুদিগের ন্যায় বনবাসী অসভ্যজাতিরাও শ্রমসাধ্য মৃগয়া দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে। সুসভ্য জাতিদিগের পরিশ্রমের ত সীমা নাই। কারণ, তাঁহাদিগের ব্যবহার্য্য এমন কোন বস্তুই নাই যাহা পরিশ্রম ব্যতিরেকে লাভ করা যায়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুই শ্রমলভ্য। অতএব পরিশ্রম সকলেরই আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই।

অল্পবয়স্ক শিশুগণ জননী-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া অনবরত হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া থাকে, ইহা দেখিয়া কে না বুঝিতে

পারে যে, শ্রম করা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত। শ্রমজীবী ব্যক্তি-গণের সুস্থ শরীর দর্শন করিয়া কাহার না বোধ হয়, যে পরিশ্রম স্বাস্থ্যের মূল কারণ। কিছুমাত্র পরিশ্রম না করিয়া নিরন্তর আলস্যে কালযাপন করিলে, প্রাণিগণ নানা রোগে আক্রান্ত ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। যাহারা প্রতিদিন নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, তাহারা সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে। দেখ, পৃথিবীর সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে জাতি যে পরিমাণে পরিশ্রম করিতেছেন, সে জাতি সেই পরিমাণেই আপন অবস্থা উন্নত করিয়া তুলি-তেছেন। আর অরণ্যবাসী অসভ্য জাতিরা চিরকালই এক অবস্থায় থাকিয়া জীবনকাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে।

পরিশ্রম দুইপ্রকার, শারীরিক ও মানসিক। এই উভয়-বিধ পরিশ্রমই মনুষ্যের হিতকর ও কর্ত্তব্য। কোন কোন ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রমকে মানহানিকর বিবেচনা করেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় কৃষিকার্য্য, পশুপালন প্রভৃতি নির্দ্দোষ কার্য্যগুলি নিন্দনীয় ও ঘৃণিত, এবং ধনিগণের উপাসনা, যৎসামান্য বেতনে চাকরি করা ইত্যাদি নানা নিকৃষ্ট কর্ম্মগুলিই সম্মানকর। কি বিষম ভ্রম! তাঁহারা কি ইতিহাস-পাঠে জানিতে পারেন না যে, যে রোমনিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একবার সাধারণী সভার সভাপতিপদে নিযুক্ত হইতেন, তিনিই আবার নিজক্ষেত্রে যাইয়া লাঙ্গলচালন করিতেন। কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কোন কার্য্যই মনুষ্যের নিন্দনীয় বোধ করা উচিত নয়। ঐগুলি শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সম্পন্ন হয়; সুতরাং শারীরিক পরিশ্রমও মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। শারী-

রিক পরিশ্রম না করিলে, শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, রমণীয় অট্টালিকায় সুশোভিত নগরী, সুদীর্ঘ জলাশয়, শীঘ্রগামী বাষ্পীয় জলযান ও বাষ্পীয় শকট, এবং অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র সকল কিরূপে উৎপন্ন হইত ?

মনুষ্যের শারীরিক শ্রম যেমন কর্ত্তব্য, মানসিক শ্রমও তদপেক্ষা প্রয়োজনীয়। মানসিক পরিশ্রমে নানাবিধ বিজ্ঞান, নানাপ্রকার দর্শনশাস্ত্র, এবং বিবিধ হিতকর বিষয়ের মূলকারণ, আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। মানসিক পরিশ্রমে নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন হয়, শারীরিক পরিশ্রমে সেই সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে। জগতে মানসিক শ্রম করে এরূপ ব্যক্তি অতি অল্প ; শারীরিকশ্রমকারীর সংখ্যাই অধিক। কেবল শারীরিক শ্রমেও মানসিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া যায় ; এবং কেবল মানসিক শ্রমেও ভালরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। অতএব নিয়মিতরূপে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রম করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

উভয়বিধ শ্রম করা কর্ত্তব্য, সত্য, কিন্তু উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। কত শত বালক প্রত্যহ রজনীজাগরণ দ্বারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া অল্প বয়সেই নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং যাবজ্জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। তাহাদের সেরূপ অপরিমিত পরিশ্রম করা নিতান্ত অন্যায়। শারীরিক শ্রমও যাহা সহ্য করিতে পারা যায়, সেইরূপ করাই কর্ত্তব্য। আমাদিগের সমাজে দুই একটী অতি চমৎকার ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমতঃ, কোন পরিবারের মধ্যে একজন উপার্জনক্ষম হইলে, অন্যান্য পরিবারগণ কেবল আলস্যে

কালযাপন করেন এবং উপার্জ্জনকারী ব্যক্তির বহুশ্রমে উপার্জিত অর্থের উপভোগী হন। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের মধ্যে কতকগুলি লোকে প্রত্যহ ১০।১৫ ঘণ্টা কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়াও উপযুক্ত জীবিকা লাভ করিতে পারে না; আর অপর কতকগুলি ব্যক্তি দিনের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা কাল পরিশ্রম করিয়াই, 'অপরিমিত পরিশ্রম করিলাম' মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবস্থা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা বলা যায় না।

৭ম—শাস্ত্রচর্চ্চা।

শাস্ত্রচর্চ্চা একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আমোদ। যখন আমাদিগের মন কোন শোকে অভিভূত, বিপদে ব্যাকুল, বা সংসারে বিরক্ত হয়, তখন নির্জনে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিলে অতি সুখে কালক্ষেপ হইতে পারে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! এই সুখের মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি জগতে অতি অল্প দেখা যায়। অলস ও ধূর্ত্তেরা শাস্ত্রচর্চ্চাকে দ্বেষ করে, পরিশ্রমী ও সরলপ্রকৃতিরা ভক্তি করে, এবং বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞেরা উহাতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রচর্চ্চায় বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও মনোবৃত্তি সকল পরিচালিত হয়; যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিবার ক্ষমতা জন্মে; এবং বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা জন্মে বলিয়া অপর ব্যক্তিকে সদুপদেশ দান করিতে পারা যায়। সভাস্থলে জয়লাভ বা বিদ্যা-প্রকাশ করা শাস্ত্রচর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত করাই

ইহার প্রধান প্রয়োজন। অর্থোপার্জ্জনও শাস্ত্রানুশীলনের চরম ফল নহে, উহা আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

শাস্ত্র নানা-প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলির আঘ্রাণমাত্র লইতে হয়, কতকগুলি বা উদরস্থ করিতে হয়, আর অপরগুলি চর্ব্বণ করিয়া জীর্ণ করিতে হয়।—অর্থাৎ কতকগুলির যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলেই যথেষ্ট, কতকগুলির আদ্যোপান্ত অভ্যাস আবশ্যক, এবং অপর কতকগুলি বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ ও মনন এবং কার্য্যে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের দেশে সর্ব্বশাস্ত্রের আংশিক জ্ঞানলাভই প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে; সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ অতি বিরল।

স্বয়ং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বহুজ্ঞতা লাভ হয়; অপরের সহিত সেই শাস্ত্রের আলোচনা করিলে উপস্থিত-বক্তা হওয়া যায়; এবং সেই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে রচনা লিখিলে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রচর্চ্চার ফলও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ইতিহাস-পাঠে বিজ্ঞতা জন্মে; সাহিত্য-পাঠে বাক্য-রচনায় নিপুণ হওয়া যায়; পদার্থবিদ্যায় প্রকৃতির গুণাগুণ জানা যায়; ধর্ম্মনীতিতে ধীরতা ও ধর্ম্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়; তর্কশাস্ত্রে বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে: গণিতশাস্ত্রে চঞ্চল বুদ্ধি স্থিরতা ধারণ করে: এবং ভূগোল-পাঠে ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার, ব্যবহার, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভৃতির জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

যাবজ্জীবন কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা করাও অনুচিত। পুস্তক-পাঠে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সত্য, কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞতা জন্মে না; জগতের আচার ও ব্যবহার দেখিয়া বিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিতে হয়; এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া জগতের উপকার-সাধনে চেষ্টা করা

কর্ত্তব্য; নতুবা শাস্ত্রচর্চ্চাকারীর বিজ্ঞতা কেবল তাঁহার মনো-মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে; সেরূপ বিজ্ঞতায় জগতের কোন উপকার হয় না।

গ্রন্থ-পাঠও বিবেচনা করিয়া করিবে। সৎ গ্রন্থ পাঠ করাই কর্ত্তব্য; অসৎ গ্রন্থ পাঠ করা কদাচ উচিত নহে। অসৎ গ্রন্থ পাঠ করিলে, বুদ্ধিবৃত্তি অসৎ পথের দিকেই ধাবমান হয়। সুতরাং মনুষ্য সমাজে হেয় ও নিন্দনীয়ই হইয়া থাকে।

৮ম—বিনয়।

বিনয় একটী মহৎ গুণ। এই গুণটী মনুষ্যের অপরাপর সমস্ত গুণের অভাব দূর করে। লোকের আর কোন গুণ না থাকিলেও যদি বিনয় থাকে, তাহা হইলে সে জগতে প্রশংসা-ভাজন হইয়া উঠে, এবং সকলেরই স্নেহপাত্র হয়; সুতরাং বিনয় দ্বারা বহুবিধ সৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। আমরা যত কেন সদ্‌গুণান্বিত হই না, যদি আমাদিগের ঐ সকল গুণের সহিত কিঞ্চিৎ অবিনয় বা আত্মশ্লাঘা মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধকলসে বিন্দুমাত্র গোমূত্র-নিক্ষেপের ন্যায়, আমাদিগের সেই সমুদয় গুণই বৃথা হইয়া যায়। আত্মশ্লাঘা করিলে অথবা সাহঙ্কার বাক্যে নিজ পদমর্য্যাদা বা ধনগৌরব প্রকাশ করিলে, অবিনয় প্রকাশ পায়; তাহাতে লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়। লোকে নির্গুণ ব্যক্তিকে যত ঘৃণা ও নিন্দা করে, আত্ম-

শ্লাঘাকারী গুণী ব্যক্তিকে তাহা অপেক্ষা অধিক করিয়া থাকে। অতএব প্রাণান্তেও নিজের প্রশংসা করা উচিত নহে; এবং যাহাতে অহঙ্কার বা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায় এরূপ ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য নয়। আর, যখন কেহ আমাদিগের গুণের অতিরিক্ত প্রশংসা করে, তৎকালে আমাদিগের বিনীতভাব প্রকাশ করা উচিত; এবং প্রশংসাকারীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যে আমরা সেরূপ প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র নহি।

আমরা যাহা বলি বা বুঝি, তাহাই অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয়, আর অপরে যাহা কিছু বলে বা বুঝে, তাহা ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ, মনে মনে এরূপ ভাবনা করাও অবিনয়ের কার্য্য। ভ্রান্তি মনুষ্যের পদে পদেই ঘটিতে পারে। আমার কখনই ভ্রান্তি হয় না এরূপ বলাতে কেবল মূর্খতা প্রকাশ পায়; এবং এরূপ মনে করাও অনুচিত। যদি কোন স্থলে কোন ব্যক্তির মত ভ্রান্তি-মূলক ও অপ্রামাণিক বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান হয়, তাহা হইলে তখন সাহঙ্কার বাক্যে নিজ মত সমর্থনপূর্ব্বক তাঁহাকে অপ্রতিভ করা উচিত নহে। তথায় বিনয় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সভাস্থলে কোন শাস্ত্রের বিচার পড়িলে, আমাদিগের দেশীয় অধিকাংশ অধ্যাপকের এইপ্রকার অবিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিনয় কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও জানেন না। এরূপ বিচারেও কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় না; কেবল বাচালতা ও অসভ্যতা মাত্র প্রকাশ পায়। অতএব আমার ভ্রম হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া সাবধানে মতপ্রকাশ করা সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

৯ম—ভব্যতা ও শিষ্টাচার।

লোক-সমাজে যিনি যেরূপ মর্য্যাদাপন্ন, তাঁহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিলে ভব্যতা ও শিষ্টাচার প্রকাশ করা হয়। পূজনীয় ব্যক্তিকে প্রণাম, সমান পদবীর লোককে হস্তস্পর্শ বা সপ্রণয় সম্ভাষণ, এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সাদর সম্বোধন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কাণা, খোঁড়া প্রভৃতির সহিত সদয় ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহাদিগকে পরিহাস ও বিদ্রূপ করা অত্যন্ত অন্যায়। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে 'তুই' বলিয়া আহ্বান করা অতি গর্হিত কার্য্য। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত যথোচিত শিষ্টাচার করিলে, সকলের আদরণীয় হইতে পারা যায়। এই সকল কার্য্য অতিসহজ, এবং মনে করিলে সকলেই করিয়া উঠিতে পারেন; অতএব এ বিষয়ে অবহেলা করা কোন মতেই উচিত নহে।

অভব্য ব্যক্তি সকলেরই অনাদরের পাত্র। ভব্যতা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিলে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয়। আমাদিগের সহস্র গুণ থাকিলেও, শিষ্টাচারের অভাবে সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া যায়। অসাধারণগুণসম্পন্ন ব্যক্তির অশিষ্টাচার সকল সময়ে ধর্ত্তব্য হয় না বটে, কিন্তু সাধারণ গুণসম্পন্নের পক্ষে সেরূপ নহে। নির্গুণ ব্যক্তিরাও সময়ে সময়ে এরূপ শিষ্টাচার দেখাইয়া থাকে, যে, সকলেই তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হয়। ভব্যতা শিখিতে হইলে কোন শিক্ষকের উপদেশের যে প্রয়োজন হয় তাহা নহে; কেবল কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া লৌকিক আচার ব্যবহার দর্শন করিলেই উহা শিখিতে পারা যায়।

ভব্যতা না শিখিলেও অনেক স্থলে মানহানি হইবার সম্ভাবনা। যদি আমি অন্যের সহিত শিষ্টাচার না করি, তবে অন্যের নিকট তাদৃশ শিষ্টাচার পাওয়া আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিবে। শিষ্টাচার না করিলে লোক কখন অনুরক্ত হয় না। লোকানুরাগ না থাকিলে কীর্ত্তির আশাও থাকে না। যাহার কীর্ত্তি নাই, তাহার জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র।

ভব্যতা-প্রকাশের সময় নিজের মান-সম্ভ্রমের দিকেও একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভব্য হইতে গিয়া চাটুকার হওয়া মূর্খের কর্ম্ম। যত দূর শিষ্টাচার করা সুসঙ্গত, তত দূর করাই কর্ত্তব্য; ততোঽধিক করিলে লোকে চাটুকার ও মিথ্যাবাদী মনে করিতে পারে। কোন ব্যক্তির মতের সহিত নিজ মতের অনৈক্য হইলে, তাহার সহিত বিরোধ করা উদ্ধত স্বভাবের কার্য্য, সত্য, কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ পর-মত সহসা গ্রাহ্য করাও কাপুরুষের কর্ম্ম। কাহারও নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিবার সময়, তদীয় উপদেশ যুক্তিসিদ্ধ কি না, তাহা নিজের যুক্তি দ্বারা বুঝিয়া লওয়া উচিত; এরূপ ব্যবহার অশিষ্টাচার বলা যাইতে পারে না। কারণ, যে স্থলে শিষ্টতা রক্ষা করিতে গেলে নিজের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তথায় সে শিষ্টাচার কখনই ন্যায্য হইতে পারে না।

১০ম—অভ্যাস।

কোন কর্ম্ম অনেকবার সম্পাদন করিলে সেই কর্ম্মে অভ্যাস জন্মে। সকল কর্ম্মই প্রায় প্রথম আরম্ভ করিবার সময় কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ঐ কর্ম্ম বহুবার করিতে থাকিলে উহা অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। নির্দ্দয় ও অধার্ম্মিক লোকে যখন জীবহত্যা, মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার মানসিক বৃত্তি সকলের মধ্যে প্রবল বিসংবাদ উপস্থিত হয়;—এক দিকে স্বার্থ-লাভের আশা সেই সকল দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে থাকে, অন্য দিকে সদসদ্বিবেক খড়্গ-হস্ত হইয়া ঐ সকল হইতে নিবৃত্ত করিতে থাকে। এইরূপ বিসংবাদের পরিণামে স্বার্থ-লাভের আশাই জয়লাভ করে। তখন সদসদ্বিবেক অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিয়া নিরস্ত হয়। পরে যখন ঐ সকল দুষ্কর্ম্ম অভ্যস্ত হইয়া আসে, তখন সদ-সদ্বিবেক একবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন আর তাদৃশ ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম করিতে পাপাত্মাদিগের কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না; সৎকার্য্য সম্পাদন করা সাধু ব্যক্তির যেরূপ সুখকর বোধ হয়, দুষ্কর্ম্ম সাধন করাও দুরাত্মাদিগের তদ্রূপ হইয়া উঠে।

অভ্যাসই এইরূপ হইবার মূল; এজন্য বিজ্ঞেরা অভ্যাসকে স্বভাবের প্রায়ই সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। স্বভাব যেমন সহজে ঘুচাইতে পারা যায় না, অভ্যাসও তদ্রূপ অনায়াসে দূর করা যায় না। যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে তস্করতা শিক্ষা করিয়া আসে, তাহাকে অল্প আয়াসে সেই দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি নিরন্তর মিথ্যা কহিতে

অভ্যাস করে, তাহাকে অল্প উপদেশে সত্যবাদী করিয়া তুলিতে পারা যায় না। কারণ, তস্করতা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি কার্য্যগুলি অভ্যাসবশতঃ তাহাদের দুষ্কর্ম্ম বলিয়াই বোধ হয় না। সদুপদেশ তাহাদের অন্তরে স্থানই পায় না। এই কারণে কারাগারে নীতি-শিক্ষা দেওয়ায় কোন ফলই হয় না। তথায় নীতি-শিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ অন্যান্য পাপিষ্ঠ কয়েদীর সহিত সংসর্গে নূতন নূতন পাপকার্য্যেরই শিক্ষা হইয়া থাকে।

অগ্নিদগ্ধ লৌহদণ্ড ও শিশুগণের অন্তঃকরণ দুইটীই তুল্য-রূপ। দগ্ধ অবস্থায় লৌহ যেমন যে দিকে ইচ্ছা নোয়াইতে পারা যায়, বালকচিত্তও তদ্রূপ শৈশবাবস্থায় যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালাইতে পারা যায়। অতএব বাল্যকাল হইতে বালক-দিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করা জনক, জননী অথবা অন্যান্য অভিভাবক, কিংবা শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য। প্রথম হইতে যত্ন না করিলে তাহাদিগের প্রবৃত্তি কুপথে ধাবিত হইবার অনেক সম্ভাবনা। সেই কুপ্রবৃত্তি একবার বদ্ধমূল হইলে, সহসা দূর করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে।

১১শ—কপটতা।

অন্যের সহিত ব্যবহারে বা কোন বিষয়কর্ম্মে চাতুরী ও প্রতারণা করা, অথবা আমাদিগের মানসিক ভাব গোপন করিয়া মুখে অন্যপ্রকার বলার নাম কপটতা। কপটতা যেরূপ

একটী মহৎ দোষ, সরলতাও তদ্রূপ একটী মহৎ গুণ। আমরা যখন যে কর্ম্ম করি, সর্ব্বত্রই সরলভাব প্রকাশ করা উচিত। কপট ব্যক্তিকে একটী কপটতা রক্ষা করিতে গিয়া অন্যান্য অনেকপ্রকার কপট ব্যবহার করিতে হয়। যদি কখন তাহার কপটতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না, সুতরাং তাহার সহিত আলাপ করিতেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু সরলান্তঃকরণ লোক সকলেরই বিশ্বাসভাজন ও আদরণীয় হন।

কোন কোন ব্যক্তি কহিয়া থাকেন, ক্রয়-বিক্রয়-সম্বন্ধীয় বিষয়কর্ম্মে চাতুরী বা প্রবঞ্চনা করা অন্যায় নহে। তাঁহাদিগের মতে, প্রতারণা না করিলে কোনপ্রকার বিষয়-কর্ম্ম চলে না। ক্রেতাকে যতই প্রতারিত করা যায়, ব্যবসায়ে ততই লাভ হইয়া থাকে। এটা তাঁহাদিগের বুঝিবার ভ্রম। প্রবঞ্চনা দ্বারা সম্পত্তি লাভ করা অতি অল্প লোকেরই ঘটে। যদিও কোন কোন স্থলে প্রতারকের সৌভাগ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অল্প কালের জন্য; অল্পদিনের মধ্যে তাহার সে সৌভাগ্য—সে শ্রীবৃদ্ধি—সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়। আপাততঃ অধিক লাভের বাসনায় প্রতারণা করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, পরকে প্রতারণা করিতে গেলে নিজেও প্রতারিত হইতে হয়। কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তি চাতুরী দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীভ্রষ্ট ও নানা কষ্টে পতিত হইয়া থাকেন। ইহা দেখিয়াও প্রতারকদিগের জ্ঞানোদয় হয় না, ইহা বড় আশ্চর্য্য!

অনেক প্রকারেই কপটতা প্রকাশ হইতে পারে। যে বালক

বিদ্যালয়ে যাই বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া পথে পথে বা অন্য কোন স্থানে খেলিয়া বেড়ায়, সে নিজ পিতা-মাতার নিকট কপটতা প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি নিজ আন্তরিক ভাব গোপন রাখিয়া অন্য ভাবে সাধারণের সহিত ব্যবহার করে, সমাজের নিকট তাহার কপটতা করা হয়। আর যে ব্যক্তি নিজ মানসিক বিশ্বাস গুপ্ত রাখিয়া বাহে অন্যধর্ম্মাবলম্বীর ভাণ করে, তাহাকে ধর্ম্মকপটী বা ভণ্ড বলা যায়। যেরূপই হউক, কপটতা সর্ব্বত্রই নিন্দনীয়। অতএব কপট ব্যবহার সকলেরই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

১২শ—অসূয়া—মাৎসর্য্য।

গুণবান্ ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন শুনিয়া কোনরূপে তাঁহার গুণের ত্রুটি বাহির করিবার ইচ্ছার নাম অসূয়া; এবং অপরের ভাল দেখিয়া মনে মনে অসুখী হইবার নাম মাৎসর্য্য। এই উভয় প্রবৃত্তিই অতিজঘন্য; কিন্তু ঈদৃশ প্রবৃত্তি নাই এমন ব্যক্তিও অতি অল্প দেখা যায়। লোকে হয় আপনার ভাল করিতে ভাল বাসে, না হয় পরের মন্দ দেখিতে ভালবাসে। যাহারা নিজের ভাল করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা পরের ভাল দেখিলে মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করে, এবং সুযোগ পাইলে মন্দ করিতেও আলস্য করে না। যাহাদের নিজ বৈষয়িক কার্য্যে কোন চিন্তা থাকে না; তাহারা পরের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অধিক

অভিলাষী হয়। নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদিগের অধিকাংশ সময়ই পরের নিন্দায় বা পরের প্রতিপত্তিলোপের চেষ্টায় অতিবাহিত হয়। মর্য্যাদাপন্ন ব্যক্তি কোন ইতর ব্যক্তির উন্নতি দেখিলে মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ, খঞ্জ, কাণ প্রভৃতি ব্যক্তিরা প্রায়ই অসূয়ু ও মৎসরী হইয়া থাকে; কারণ, তাহারা আপনা-দিগের অবস্থা কখনই উন্নত করিতে পারে না, সুতরাং অপরকে অপদস্থ করিবার অভিলাষ করে।

সহাধ্যায়ী, সহকর্ম্মচারী, এবং জ্ঞাতিগণের মধ্যে অসূয়া ও মাৎসর্য্যের প্রবল প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুশিক্ষিত ছাত্রের গুণকীর্ত্তন শুনিলে নির্গুণ ছাত্র অসূয়ান্বিত হয়। সম-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে উন্নতির ন্যূনাধিক্য ঘটিলে, যাহার অল্প উন্নতি হয়, সে ব্যক্তি অধিক-উন্নতিশালী জনের মৎসরী হইয়া থাকে। মাৎসর্য্যই জ্ঞাতিবিরোধের প্রধান কারণ। যাহাকে অনেক কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, অপরকে অল্পপরিশ্রমে উপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিলে, তাহার মনে অত্যন্ত বিদ্বেষ ও অসুখ জন্মিয়া থাকে। এইজন্যই দরিদ্রেরা ধনী লোকের মৎসরী হইয়া থাকে।

কিন্তু সুযোগ্য ব্যক্তির উন্নতি দেখিলে, বোধ হয়, অতি অল্প লোকই মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। কারণ, পরস্পর তুলনা করিয়াই মাৎসর্য্য জন্মে। কিন্তু যিনি অসাধারণ-গুণ-সম্পন্ন, এবং যাঁহার সহিত প্রায় কাহারও তুলনা সম্ভবে না, তাঁহার উন্নতিতে কেহই দুঃখিত হয় না। রত্ন মস্তকে ধৃত দেখিলে কে অসুখী হয়? বস্তুতঃ সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের মধ্যেই অধিক অসূয়া ও মাৎসর্য্য দেখা যায়। এক রাজার শ্রীবৃদ্ধি

দেখিলে অন্য রাজার মাৎসর্য্য ও বিদ্বেষ জন্মে; কিন্তু রাজার উন্নতিতে প্রজার কখনই মাৎসর্য্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

সমকক্ষদিগের মধ্যেও আবার যাহার ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া থাকে, তাহার উপর লোকদিগের বড় দৃষ্টি পড়ে না; কিন্তু যাহার সহসা উন্নতি ঘটে, সে ব্যক্তি অপরের অধিক অসূয়া ও মাৎসর্য্যের পাত্র হইয়া থাকে। কারণ, তাহার উন্নতি দেখিয়া অপর লোকেরা স্বীয় ন্যূনতা অধিকপরিমাণে অনুভব করে, সুতরাং সমধিক মনোবেদনাও ভোগ করিয়া থাকে।

এইরূপ নানা কারণে ও নানা বিষয়ে লোকদিগের মাৎসর্য্য প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুষ্প্রবৃত্তিকে আমাদিগের অন্তঃকরণে কোন মতেই স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মাৎসর্য্য উভয় পক্ষেরই দুঃখের কারণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা উহা প্রকাশ করে, সে কখন মানসিক সন্তোষ লাভ করিতে পারে না; পরের মঙ্গল, হৃদয়বিদ্ধ শল্যের ন্যায়, অহরহঃ তাহার যন্ত্রণা উৎপাদন করিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি মাৎসর্য্যের পাত্র হয়, সেও কিছুতেই মনের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে না; তাহার পদে পদে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। একবার লোকের মাৎসর্য্যরূপ বিষ-দৃষ্টিতে পড়িলে, উন্নতিশালী ব্যক্তি যতই বিনীত ব্যবহার বা সৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করুন না কেন, লোকে তৎসমুদায় স্বার্থপূর্ণ বা দুরভিসন্ধি-মূলক মনে করে, এবং সর্ব্বত্র তাঁহার অখ্যাতিই করিয়া বেড়ায়। এরূপ অসূয়া ও মাৎসর্য্যশালী ব্যক্তির ন্যায় অভদ্রলোক জগতে আর নাই।

১৩শ—বন্ধুতা।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিয়াছেন—"যে জন নিরন্তর নির্জনে থাকিতে ভালবাসে, সে হয় ত বনজাত পশু অথবা দেবতুল্য মনুষ্য"। ইহার তাৎপর্য্য এই—যাহারা লোকালয় ত্যাগ করিয়া জনশূন্য অরণ্যে গিয়া বাস করে, তাহাদিগকে মনুষ্য-মধ্যে গণ্য না করিয়া বরং বন্যপশুর সমান মনে করা উচিত; কিন্তু যাঁহারা জগদীশ্বরের আরাধনার্থ ঐরূপ বনবাস অবলম্বন করেন, তাঁহারা দেবতুল্য মনুষ্য, সন্দেহ নাই। নির্জনে বাস করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ নহে। আমরা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতেই ভালবাসি, এবং না থাকিলেও চলে না। সমাজে অনেকপ্রকার লোকের সহিত আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হয়; তন্মধ্যে কতকগুলির সহিত আত্মীয়তা, কতকগুলির সহিত আলাপমাত্র, এবং অতি অল্প লোকের সহিত প্রকৃত বন্ধুতা জন্মে। এই জগতে আমরা পুত্রের নিকট পিতা, পত্নীর নিকট স্বামী, কুটুম্বের নিকট আত্মীয়, ও স্বজাতির নিকট পরিচিত, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর নিকট তাহার মূর্ত্তি-ভেদ মাত্র। এই ভূমণ্ডল একটী বিস্তীর্ণ চিত্রশালা; ইহাতে নানাবিধ মূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যে চিত্রটীর সহিত আমাদিগের অধিকাংশ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই চিত্রেই আমাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; তাহাই আমাদিগের আদর ও অনুরাগের বস্তু হইয়া উঠে; এবং সেই ক্ষণ হইতেই বন্ধুতার উৎপত্তি হয়।

উভয়ের সম্পূর্ণরূপ সাম্য না ঘটিলে প্রকৃত বন্ধুত্ব জন্মে না। সাম্য অনেক বিষয়ে ঘটিতে পারে,—বয়সে সাম্য, গুণে সাম্য,

জ্ঞানে সাম্য, অথবা অবস্থায় সাম্য। বালকে বালকে, যুবকে যুবকে, এবং প্রাচীনে প্রাচীনে বন্ধুতা অনায়াসেই ঘটিতে পারে। পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, মূর্খের সহিত মূর্খের, সাধুর সহিত সাধুর এবং অভদ্রের সহিত অভদ্রের বন্ধুতা সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপে, ধনীর সহিত ধনী লোকের, দরিদ্রের সহিত দরিদ্র লোকের, এবং মধ্যবিত্তের সহিত মধ্যবিত্ত লোকের বন্ধুতা অক্লেশেই সঙ্ঘটিত হইতে পারে। এইজন্যই কোন কবি লিখিয়াছেন—"উত্তমে উত্তম মিলে, অধমে অধম।

কোথাও নাহিক মিলে, অধমে উত্তম॥"

কিন্তু সকলপ্রকার সাম্যের মধ্যে মানসিক বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সাম্যই যথার্থ বন্ধুতার উৎপাদক। যাহাদিগের এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্য্যে অনুরক্তি, তাহাদিগেরই প্রকৃত বন্ধুত্ব জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জগতে সর্ব্ববিষয়ে সাম্য সম্ভব নহে। যাহাদের মনোবৃত্তি সমান, হয় ত তাহাদিগের সম্পত্তি সমান নহে; আবার যাহাদিগের সম্পত্তি সমান, হয় ত তাহাদিগের মনোবৃত্তি সমান নহে। সুতরাং যথার্থ বন্ধু নিতান্ত বিরল। তবে যাহাদিগের সহিত আমাদিগের কতক অংশে ঐক্য থাকে, তাহাদিগকেই আমরা বন্ধু বলিয়া গণনা করি।

আমরা অকৃত্রিম ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু লাভ করিতে পারি না বলিয়া, বন্ধুহীন হইয়াও থাকিতে পারি না। বন্ধুহীনের পক্ষে এ সংসার অরণ্যস্বরূপ। বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্যহীন ভুবন, উভয়ই সমান। বন্ধু ব্যতিরেকে মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না। কি আশ্রমী, কি নিরাশ্রম, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই প্রণয়াস্পদ বন্ধুর সহিত আলাপ-সুখ অনুভব করিয়া

থাকেন। অকৃত্রিম বন্ধুতার গুণও বিস্তর। প্রকৃত বন্ধু আমা-দিগকে হিত উপদেশ দিয়া থাকেন, সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গল কামনা করেন, এবং আমাদিগের সুখে আন্তরিক সুখ অনুভব করেন। আমাদিগের সম্পত্তির যাহাতে বৃদ্ধি হয় তিনি তাহার উপায় প্রদর্শন করেন, বিপত্তির সময়ে সাহায্য প্রদান করেন, এবং শোকের সময় সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। অকৃত্রিম বন্ধুকে দর্শন করিলে শরীর শীতল হয়, চিত্ত প্রফুল্ল হয়, এবং সমস্ত জগৎ আনন্দময় বোধ হয়। প্রিয়তম বন্ধুর সহিত আলাপ শ্রবণযুগলে অমৃত-ধারা বর্ষণ করে, এবং অন্তঃকরণে প্রীতি-প্রবাহ প্রবাহিত করে। তাদৃশ বন্ধুর সমক্ষে আমাদিগের কিছুই গোপন থাকে না; হৃদয়ের অতিগোপনীয় রহস্য প্রকাশ করিতেও সঙ্কোচ হয় না।

অকৃত্রিম বন্ধুর সংসর্গ যেমন মনোহর ও হিতকর, কৃত্রিম বা কপট বন্ধুর সহিত বাসও তেমনি অপকারক। কপট বন্ধুর দোষে আমাদিগের চিত্ত দূষিত হয় কিন্তু আমরা উহাকে ভাল-বাসি বলিয়া আপাততঃ তাহা বুঝিতে পারি না। তাদৃশ বন্ধু আমাদিগের মনের মত ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং আমাদিগের দোষ গোপন করিয়া কেবল গুণেরই প্রশংসা করে। কিন্তু অকৃত্রিম বন্ধু তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন। তিনি আমাদিগের দোষ দেখাইয়া দিয়া, যাহাতে ঐ দোষের শোধন হয় এরূপ উপায় বলিয়া দেন; চাটুকারের ন্যায় কখন আমাদিগের সমক্ষে আমাদিগের গুণের প্রশংসা করেন না। কপট বন্ধুর ন্যায় অপরের সমক্ষে আমাদিগের নিন্দা করেন না, বরং অন্যের নিকট বন্ধুর প্রশংসাই করিয়া থাকেন।

অতএব কে কৃত্রিম, কে বা অকৃত্রিম, ইহা প্রথমে ভালরূপে বুঝিয়া দেখিয়া বন্ধুত্ব-পাশে বদ্ধ হওয়া উচিত। নতুবা কপট বন্ধুর সহিত সরল ব্যবহার করিলে, পরিণামে অনেক বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা।

১৪শ—ব্যয়।

ধন উপার্জ্জন করিতে অনেকেই পারেন, কিন্তু অতি অল্প লোকেই উহার উপযুক্ত ব্যয় করিতে জানেন। উপার্জ্জন-কালে যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োজনীয়, ব্যয়ের সময় তদপেক্ষা অধিকতর ধীশক্তি আবশ্যক করে। অনেক লোকে অর্জ্জন করিতে যেরূপ ক্লেশ সহ্য করে, ব্যয়কালে তাহার দ্বিগুণ কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ লোকেরা কৃপণস্বভাব হইয়া পড়ে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, ধন সম্মানরক্ষা ও সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবারই নিমিত্ত; উহাতে আর কিছু প্রয়োজন নাই। সৎকর্ম্ম-সাধনে কৃপণতা করা অতিগর্হিত কর্ম্ম। স্বদেশের মঙ্গলার্থ উপযুক্ত সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় করাও দূষণীয় নহে; কিন্তু বৃথা আমোদ ও কৌতুক দর্শন করিবার জন্য কপর্দ্দক-ব্যয়ও নিন্দনীয়।

যাহার যেরূপ আয়, তাহার তদনুযায়ী ব্যয় করা কর্ত্তব্য। ওজন বুঝিয়া চলিতে না পারিলে, পরিণামে রিক্তহস্ত হইবার সম্ভাবনা। যদি সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করিবে; আর যদি সম্বল করিতে

চাও, তবে তৃতীয়াংশ মাত্র ব্যয় করিবে। ধনবান্‌দিগের সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত, যেন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিতে না পারেন। আর বাহিরে এরূপ সম্ভ্রমে চলা উচিত যে, লোকে যত মনে করে, তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যত বড় ধনী হও না কেন, আপনার বিষয় সম্পত্তি আপন চক্ষে তত্ত্বাবধান করাই উচিত, তাহাতে অগৌরবের সম্ভাবনা নাই। লোকে বলে, "আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে"। আর যদি একান্তই নিজে তত্ত্বাবধান করিতে না পারা যায়, তবে এরূপ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা উচিত যে, সে যেন নিরর্থক ব্যয় করাইয়া প্রভুর সমস্ত ধন নিঃশেষ না করে।

যদি এক বিষয়ে অধিক ব্যয় করিতে চাও, তবে অন্য বিষয়ে ব্যয় কমাইতে হইবে। আহারের পারিপাট্য-বিষয়ে প্রভূত ব্যয় করিলে, পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে। যদি বাসগৃহের সজ্জায় অধিক ব্যয় করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে অশ্ব-শকটাদি বাহন ও যানের ব্যয় কিছু ন্যূন করিতে হইবে। নতুবা একেবারে চারিদিকে যথেষ্ট ব্যয় করিলে, একেবারে নির্ধন হইবার সম্ভাবনা। এই কারণেই অনেক ধনীলোকের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অচিরকালমধ্যেই নির্ধন হইয়া পড়েন।

অনেকে ঋণ করিয়া ব্যয় করিয়া থাকেন। ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় না থাকিলে, ঋণ করা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। তাদৃশ ঋণ পরিশোধ হইয়া উঠে না। ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যয়ের ন্যূনতা না করিলে কখন ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না। একেবারে অঋণী হইব

মনে করিয়া বিষয়-সম্পত্তি সমুদায় বিক্রয় করাও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কারণ, তাহাতে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এবং সংসারব্যয়-নির্ব্বাহার্থ পুনর্ব্বার অন্য উত্তমর্ণ অন্বেষণ করিতে হয়। অতএব ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করাই উচিত ও সুসাধ্য। ইহার আর একটী গুণ এই যে, ঐরূপে ঋণশোধের সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয়িতাও অভ্যস্ত হইয়া আসে।

নিত্য কর্ম্মে ব্যয় করিবার সময় নিজ আয় বিবেচনা করা উচিত; কিন্তু নৈমিত্তিক বা সামাজিক কার্য্যে মুক্তহস্ত হওয়া কর্ত্তব্য; না হইলে সম্ভ্রম রক্ষা হয় না, এবং সে কার্য্যও সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না। আমাদিগের দেশীয় কৃপণস্বভাব ধনীরা এবিষয়ে বড় মনোযোগ দেন না। তাঁহারা মৃত্যুর সময় প্রভূত অর্থ-রাশি অপরিণতমতি ঔরস পুত্রে অথবা মূর্খ পোষ্য পুত্রে অর্পণ করিয়া যান। পুত্রেরা স্বল্পদিনের মধ্যেই ঐ সম্পত্তি বৃথা ব্যয়ে নিঃশেষ করিয়া ফেলে। হায়! ধনবানেরা কি বুঝেন না, যে, অর্থ চিরস্থায়ী নয়, এবং সৎপাত্রে দান করিলেই অর্থের যথার্থ সার্থকতা হয়। আমাদিগের অসময়ের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করা আবশ্যক, সত্য; কিন্তু অসীম অর্থরাশি একত্র করিয়া রাখিবার ফল কি? হে দেশীয় ধনিগণ! মৃত্যুকালের পূর্ব্বে যেন আপনাদিগের মনে এই ভাবের উদয় হয়। তাহা হইলে জগতের যথার্থ উপকার সাধন করিয়া, জীবন সার্থক করিয়া যাইতে পারিবেন।

১৫শ—সৌভাগ্য—দুর্ভাগ্য।

গুণবান্ বা বিদ্বান্ হইলেই লোকে সৌভাগ্যশালী হয় না। কত শত গুণী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ জনসমাজে অজ্ঞাত থাকিয়া হীন দশায় দিন যাপন করিয়া থাকেন। সৌভাগ্য লাভ করিতে কতকগুলি সুযোগ ও সুসময় আবশ্যক হয়। বড় লোকের অনুগ্রহ, অন্যের মৃত্যু, ক্ষমতা-প্রকাশের সুযোগ ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় কেবল পুরুষের যত্নে কথনও সফল হয় না। এইগুলিও সকল সময় সকল লোকের ভাগ্যে ঘটে না। ফলতঃ অনুকূল ঘটনা ও সময় বুঝিয়া চেষ্টা করিতে পারিলে, লোকে প্রায় নিষ্ফল হয় না। কিন্তু অনুকূল ঘটনা বুঝিয়া লওয়াও সহজ নহে। যে বুঝিতে পারে, সে ব্যক্তিই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। কিরূপ কৌশলে উহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাও নির্দ্দেশ করা নিতান্ত কঠিন। সময় বুঝিয়া নানাপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতে হয়। এই সকল কৌশল বুঝিতে অধিক বিদ্যারও প্রয়োজন হয় না। অতি সামান্য অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও যে সকল কৌশলে অতি অল্প দিনের মধ্যে সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন সুশিক্ষিত লোকেরাও সেগুলি সহসা বুঝিতে পারেন না।

অতি ধার্ম্মিক বা অত্যন্ত দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা প্রায় কথনই সৌভাগ্যশালী হন না। কারণ, তাঁহাদিগের সমুদয় কার্য্যই পরের হিতজন্য এবং সমুদয় চিন্তাই দেশহিতকর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে। তাঁহারা ইতরব্যক্তির ন্যায় স্বার্থের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে অভিলাষ করেন না। অতিবুদ্ধি বা অতিশয়

বিত্যানুরাগী ব্যক্তিকেও প্রায় ধনবান্ হইতে দেখা যায় না। এইজন্যই লোকে প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পরস্পর চির-শক্রতা। সৌভাগ্যের যদি কোন নির্দ্দিষ্ট পথ থাকিত, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ বা বিদ্বান্ ব্যক্তিরা অবশ্যই তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইতেন। কিন্তু ভাগ্যের কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম বা পদ্ধতি নাই। আকাশস্থিত ছায়াপথ যেমন কতকগুলি তারকার সমষ্টিমাত্র, সৌভাগ্যও সেইরূপ কতকগুলি কৌশলের একত্র মিলন-স্বরূপ। অনেকেই এক একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে; কিন্তু যিনি অনেকগুলি কৌশল একত্র করিতে সমর্থ হন, তিনি শীঘ্র সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠেন।

কাহাকেও হঠাৎ ভাগ্যবান্ হইতে দেখিলে, অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন, এবং সেই ব্যক্তির অপরিসীম বুদ্ধি ও বিদ্যা আছে মনে করিয়া, তাঁহাকে প্রশংসা করেন। অনেকে অনুকূল দৈববলও স্বীকার করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণকে প্রবোধ দেন। কিন্তু হয় ত তাদৃশ সৌভাগ্য অতিসামান্য সুযোগেই লব্ধ হইয়া থাকিবে; এবং সেরূপ সুযোগ সকলের পক্ষেও না ঘটিতে পারে। এ স্থলে তাদৃশ সৌভাগ্যে ঈর্ষা প্রকাশ না করিয়া, বরং অভিনন্দন করাই উচিত।

সৌভাগ্যশালী পুরুষ লোকসমাজে প্রায়ই বিশ্বাসপাত্র ও সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যাঁহার প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে, তাঁহার উপরেই লোকে বিশ্বাস ও সম্মান প্রদান করিয়া থাকে। এইনিমিত্ত প্রায় সকল দেশেই ভাগ্যবান্ পুরুষদিগকে সকল বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখা যায়।

সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সমাজে যেরূপ সম্মান লাভ করেন, হতভাগ্য লোকও তদ্রূপ অপমান সহ্য করিয়া থাকে। ভাগ্য-হীন হইয়া লোকালয়ে বাস করা অপেক্ষা বনে গিয়া বাস করা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। হতভাগ্য ব্যক্তিকে কেহ আদর করে না, এমন কি, তাহার মুখ পর্য্যন্ত দেখিতেও ইচ্ছা করে না। তাহার জীবনধারণ কেবল কষ্টের জন্য।

১৬শ—উচ্চ পদ।

লোকে বলে "বড় গাছে বড় ঝড়"; এই প্রবাদটী সম্পূর্ণ সত্য ও সারবান্। উচ্চ পদ অনেকের অভিলষণীয় বটে, কিন্তু উচ্চ পদে অনেক বিপদ্। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তি অনেক স্থলে পরের দাস, যশের ভিক্ষুক, এবং কার্য্যের অধীন হন; কোনও বিষয়ে বা কোনও সময়ে তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। পরের চিন্তায় সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়, সুতরাং নিজ স্বচ্ছ-ন্দের প্রতি দৃষ্টি করিতে অবকাশ পান না। উচ্চ পদের আশায় লোকে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন; এবং অনেকের উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া নিজের উপর প্রভুত্ব হারাইয়া বসেন। উচ্চ পদে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে অনেক কষ্ট ও অনেক অব-মান সহ্য করিতে হয়; আর, পদস্থ হইবার পরও অন্যপ্রকার অনেক মানসিক ক্লেশে গিয়া পড়িতে হয়।

উচ্চ-পদারূঢ় ব্যক্তি একটী মহৎ কার্য্য করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে

পারেন না। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নানা সৎ কার্য্য করিয়া লোকের মন পরিতুষ্ট রাখিতে হয়। দৈবাৎ তাঁহার কোন প্রমাদ ঘটিলে, লোকের দৃষ্টি সেই দিকেই গিয়া পড়ে; তাঁহার পূর্ব্বাচরিত সৎকর্ম্মগুলি যেন এককালে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তাঁহার তিলমাত্র দোষটীকে লোকে তালপ্রমাণ করিয়া তুলে। তখন চারি দিকে অযশের তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যথার্থ গুণগুলিও সেই দোষপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। তৎকালে উচ্চ পদ অতিকষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। পরিত্যাগ করা উচিত বোধ হইলেও সহসা ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা হইলেও লোভ সংবরণ করিতে পারা যায় না। আরও, যাহারা কিছুদিন লোকের নিকট মান-সম্ভ্রমে কাটাইয়াছেন, তাঁহারা শেষ দশায় অপ্রকাশ্যভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন না। জীবনের শেষপর্য্যন্ত সামাজিক কার্য্যে লিপ্ত থাকেন।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উচ্চ পদে অসুখ বই সুখের লেশমাত্র নাই। পরের অভিপ্রায়ের উপর যাহাদিগের সুখ নির্ভর করে, তাহারা কিপ্রকারে সুখী হইতে পারে? উচ্চ পদের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া আমরা তৎপদারূঢ় ব্যক্তিকে সুখী মনে করি, কিন্তু যদি তাঁহার মানসিক ভাব অবগত হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার কিছুমাত্র সুখ দেখিতে পাই না। নিজের গুণ-দোষ জ্ঞাত হওয়া অপেক্ষা নিজের সুখ-দুঃখ জানিতে পারা অতিসহজ। কারণ, পদস্থ ব্যক্তির স্বীয় গুণ-দোষ অনুসন্ধান করিবার অবকাশ থাকে না; কিন্তু স্বকীয় অসুখ পদে পদে অনুভূত হইয়া থাকে।

উচ্চ পদে যেমন বিস্তর অসুখ, উচ্চপদের দোষও তেমনি

অনেক। উহাতে দীর্ঘসূত্রিতা, অনুরোধ-রক্ষা, ও রূক্ষস্বভাব প্রভৃতি অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির হস্তে ভাল ও মন্দ দুইই করিবার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু মন্দ করিবার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়া ভাল করিবার ক্ষমতা পরিচালন করাই ধার্ম্মিকের কর্ম্ম। ভাল করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে হইল, তাহা নহে, ভাল করিবার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সম্পাদনও কর্ত্তব্য। নতুবা বিলম্ব করিলে কখনই লোকানুরাগ লাভ করিতে পারা যায় না। এই দীর্ঘ-সূত্রিতা-দোষ থাকাতেই "বড় লোকের তের মাসে বৎসর" এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের নিমিত্ত উপযুক্তরূপে সময় বিভাগ করিয়া রাখিলেই, এই অপবাদ ঘটিতে পারে না। নতুবা এককালে নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলে কোন কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না।

অনুরোধ-রক্ষার্থ কর্ত্তব্য কার্য্যের পরিবর্ত্তন অথবা ন্যায়ানু-গত বিচারের অন্যথাচরণ করা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির একটী মহৎ দোষ। অনুরোধে পড়িয়া অন্যায্য পথে পদার্পণ করিলে, লোকসমাজে নিন্দনীয় ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে হয়।

উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির স্বভাব রূক্ষ হওয়াও অনুচিত। রূক্ষ কথায় লোকে হঠাৎ বিরক্ত হইয়া উঠে। ভয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিতে না পারিলেও, মনে মনে ঘৃণা করিয়া থাকে। রূক্ষ-স্বভাব প্রভুর সকল সময় মানরক্ষা হওয়া দুষ্কর। অতএব উচ্চ পদ ও বিনীত ব্যবহার একত্র মিলিত হইলে, মণি-কাঞ্চ-নের যোগ হইয়া উঠে।

১৭শ—স্বার্থপরতা—স্বার্থপ্রিয়তা।

জগতে পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতে পারে না; এইজন্য মনুষ্যজাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমাজে সকলেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকে। অন্যের ভাল হউক এবং আমার মন্দ হউক, এরূপ ইচ্ছা বোধ হয় কাহারও অন্তঃকরণে উদিত হয় না। বরং অপরের মন্দ করিয়া আপনার ভাল করা অনেকেরই আন্তরিক বাসনা। তাদৃশ ব্যক্তিকে লোকে নিতান্ত স্বার্থপর কহিয়া থাকে; সেরূপ ব্যক্তি কখনই প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। আপনার অভীষ্টসাধনে ব্যস্ত থাকা অথবা নিজ অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করা কখনই নিন্দনীয় নহে; কিন্তু অপরের ক্ষতি বা সর্ব্বনাশ করিয়া স্বার্থসাধন করিলে, সর্ব্বত্রই নিন্দার ভাজন হইতে হয়। সকলেই এইরূপ স্বার্থপর হইলে, সমাজ একবারে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিশেষতঃ, রাজ-পুরুষদিগের এবং যাহাদিগের হস্তে বহুলোকের অর্থ গচ্ছিত আছে, তাঁহাদিগের স্বার্থপর হওয়া একপ্রকার বিশ্বাস-ঘাতকতার কর্ম্ম। রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা (সম্রাট্) স্বার্থপর হইলে বরং একদিন শোভা পায়; কারণ, সমস্ত রাজ্যের অর্থই তাঁহার স্বার্থ; কিন্তু প্রজাগণ সকলেই স্বার্থপর হইয়া চলিলে রাজ্যের আর মঙ্গল থাকে না। রাজ্যের মধ্যে যাঁহারা যেরূপ মর্য্যাদাপন্ন ও উচ্চপদারূঢ়, তাঁহাদিগের স্বার্থপরতা সমাজের সেই পরি-মাণেই অপকার করে। একজন ইতর ব্যক্তির স্বার্থপরতায় অতি অল্প লোকের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যাঁহাদিগের

উপর মন্ত্রিত্ব, ধনাধ্যক্ষতা প্রভৃতি গুরুতর ভার অর্পিত আছে, তাঁহাদিগের এই প্রবল দোষ থাকিলে, সমস্ত রাজ্যই উৎসন্ন হইয়া যায়। যে সকল লোক আপনাদিগের স্বার্থ-সাধনার্থ প্রভুর বিস্তর ক্ষতি করিতে পারে, তাহারা স্বকীয় শীত নিবারণ জন্য অন্যের গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

ফলতঃ, স্বার্থপরতা ও স্বার্থপ্রিয়তা এই দুইটী শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বার্থপ্রিয় হইলে কাহারও নিকট নিন্দনীয় হইতে হয় না, কিন্তু স্বার্থপর ব্যক্তি সর্ব্বত্রই নিন্দা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়। স্বার্থপর ব্যক্তির উন্নতি অধিককালস্থায়ী হয় না। অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিলে, লোকে প্রায় সুখে কালযাপন করিতে পারে না: অনুতাপ ও আত্মগ্লানি আসিয়া তাহার অন্তঃকরণ অধিকার করে; এবং দৈববশতঃ যদি কখন দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তখন কেহই তাহার দুঃখে দুঃখিত হয় না। অতএব পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার ইষ্টসাধন করা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য।

১৮শ—সত্য ও মিথ্যা।

আমাদিগের অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহার যথার্থ কথনকে সত্য-কথন বলে। আর তাহার বিপরীত কথনের নাম মিথ্যা-কথন। নিতান্ত শিশুগণের মুখে

কখনও মিথ্যা শুনিতে পাওয়া যায় না। ক্রমে যখন তাহারা সংসারের চাতুরী বুঝিতে বা শিখিতে পারে, তখন মিথ্যা কহিতে আরম্ভ করে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, সত্য-কথন জগদীশ্বরের অভিপ্রেত এবং আমাদিগের হিত-সাধক; সত্যের পথে কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে না। শাস্ত্রে কহে, সত্যের পথ আলোকময়, এবং মিথ্যার পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সত্যের ফল সুখ, এবং মিথ্যার ফল দুঃখ। অতএব সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সত্য কথা কহা অতি আবশ্যক। সত্যবাদীকে সকলে আদর ও বিশ্বাস করিয়া থাকে।

মিথ্যাকথনের অশেষ দোষ। একটী মিথ্যা ঢাকিতে গিয়া আরও পাঁচটী মিথ্যা কহিতে হয়। ক্রমে মিথ্যা কহিবার অভ্যাস জন্মিয়া যায়। তখন সত্য কহিতে আর প্রবৃত্তি জন্মে না। এরূপ লোক সর্ব্বদাই নিজের ও অপরের ক্ষতি করিয়া থাকে। লোকে তাহাকে কখনও বিশ্বাস করে না। সে ব্যক্তি কদাচিৎ সত্য কহিলেও, লোকে মিথ্যা মনে করিয়া অগ্রাহ্য করে। সুতরাং মিথ্যাবাদীকে সমাজে অবমানিত ও অবিশ্বস্ত হইয়া থাকিতে হয়। অতএব কাহারও কখন মিথ্যা কথা কহা উচিত নহে।

মিথ্যাকথন নানাপ্রকার আছে। তন্মধ্যে সকলগুলি সমান অপকারক নহে। কোন কোন মিথ্যাকথনে কত লোকের সর্ব্বনাশ ও প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া যায়। কোন কোনটীতে বা যৎসামান্য ক্ষতিমাত্র হয়। অতএব অত্যন্ত অপকারজনক মিথ্যাকথন নিতান্ত দূষণীয়। কিন্তু কাহারও অপকারক নয় অথচ স্বার্থসিদ্ধি হয়, এরূপ মিথ্যাকথনে তাদৃশ দোষ দেখা যায়

না। দোষ দেখা না গেলেও সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাতেই মিথ্যাবাদীর অপযশ ঘটে এবং তাহার প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। অবিশ্বাস একবার বদ্ধমূল হইলে তাহা দূর করা বড় কঠিন।

অনেকে কহিয়া থাকেন, মিথ্যা কথা ব্যতিরেকে কোন বাণিজ্য-ব্যবসায় চলে না। তাঁহারা কহেন, "অধিকাংশ ক্রেতার এরূপ সংস্কার হইয়া গিয়াছে, যে, বিক্রেতা হাজার সত্যবাদী হউক, তথাপি মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে। তাঁহাদিগের সে সংস্কার কিছুতেই ঘুচে না। সুতরাং তাদৃশ ক্রেতাদিগের নিকট বিক্রেতাদিগকে নানা মিথ্যা কথা কহিতে হয়।" উক্ত ব্যক্তিদিগের এইরূপ মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, বিক্রেতা যদি একদরে বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবেন এমন প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর মিথ্যা কথা কহিতে হয় না।

আরও এরূপ অনেক স্থল আছে, যেথানে সত্যকথন অপেক্ষা মিথ্যাকথন অধিক উপকারক। যে স্থলে মিথ্যা কহিলে এক জনের জীবন রক্ষা হয়, সে স্থলে মিথ্যাকথন অনেকের মতে দূষণীয় নহে। কারণ, সেরূপ স্থলে সত্যকথনে বিস্তর অপকার, কিন্তু মিথ্যাকথনে অপরিসীম উপকার। কিন্তু নিতান্ত দুরাচার বা ঘোর পাপিষ্ঠ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিথ্যাকথন কখন কর্ত্তব্য নহে।

১৯শ—সন্দেহ।

অনেকে সকল বিষয়েই সন্দেহ করে, এবং কাহাকেও বিশ্বাস করে না। পক্ষি-মধ্যে পেচকও যেরূপ, মনুষ্য-মধ্যে তাদৃশ সন্দিহান ব্যক্তিও সেইরূপ। পেচকগণ যেমন সদা শঙ্কিত ও অন্ধকারপ্রিয়, সন্দিহান ব্যক্তিও তদ্রূপ কোন কার্য্য নির্ভয়ে সম্পন্ন করিতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদা বিষণ্ণচিত্ত ও চিন্তাযুক্ত থাকে; এবং কখন কখন অতিতুচ্ছ কারণেও বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়। এইরূপ স্বভাব অন্তঃকরণের এক-প্রকার রোগ বলিতে হইবে, এবং এই যাতনাদায়ক ব্যাধি যাহাতে একেবারে আরোগ্য হয়, অথবা স্থগিত থাকে, তাহা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। নতুবা কেবল সন্দিহান ব্যক্তিই নহে, তাহার সঙ্গে যাহাদিগের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহারাও কষ্ট পাইয়া থাকে। রাজা সন্দিহান হইলে প্রজাগণ কষ্ট পায়; এবং গৃহস্থ সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে পরিবারবর্গ ক্লেশ পাইয়া থাকে।

কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, সকলপ্রকার লোককেই এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে বিজ্ঞেরা ভালরূপে বিবে-চনা করিয়া দেখিলে, এই রোগ হইতে শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে পারেন; কিন্তু মূর্খদিগের একবার সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাহা তাহারা সহজে অন্তঃকরণ হইতে দুর করিতে পারে না। কারণ, সকলপ্রকার সন্দেহই অজ্ঞান হইতে জন্মে। যাহারা কোন বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না, তাহারাই সেই বিষয়ে নানা সন্দেহ তুলিয়া থাকে। তাহাদিগের এই সন্দেহ-রোগ হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিতে হইলে অগ্রে তাহাদিগকে জ্ঞান

উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। যেরূপ সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয় হইলেই সন্দেহ সহজে দূর হইয়া থাকে।

ভাবিয়া দেখিলে, মনুষ্যের অনেক সন্দেহস্থল হইতে পারে। এবং অনেক স্থলেও সন্দেহ অমূলক না হওয়াই সম্ভব। মনে কর, তোমাকে প্রতিদিন নানাবিধ প্রকৃতির লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, এবং অনেক লোককে তোমার প্রতিনিধি-স্বরূপ নিযুক্ত করিতে হয়; এ স্থলে সকলকেই কি ধার্ম্মিক ও লোভশূন্য মনে করিবে, অথবা সকলকেই স্বার্থপর ও অধর্ম্ম-নিষ্ঠ ভাবিয়া সদা সন্দেহ করিবে? সংসারের গতি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, একেবারে স্বার্থশূন্য ও নিতান্ত ধার্ম্মিক লোক অতিবিরল। সুতরাং কাহাকেও অতিবিশ্বাস করিলে অনেক সময় ঠকিতে হয়। আর, সকলকেই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিলেও কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না; যথার্থ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিকেও অধার্ম্মিক বলিয়া সন্দেহ করিলে, পাপের ভাগী হইতে হয়। অতএব সন্দেহের কারণ থাকিলেও, অনেক স্থলে আন্তরিক সন্দেহ লুকায়িত রাখিয়া, আত্ম-সাবধান হইয়া চলা উচিত।

সন্দেহ দুই প্রকারে জন্মিতে পারে; কোন কোন প্রকার সন্দেহ আপনা হইতেই অন্তঃকরণে উদিত হয়; অপর কতক-গুলি অন্যের মুখ হইতে শুনিয়া জন্মে। যে সন্দেহগুলি অন্য ব্যক্তির মুখে শুনিয়া জন্মে, সেগুলি অধিক ক্লেশদায়ক; এজন্য তাদৃশ সন্দেহ যাহাতে শীঘ্র দূরীভূত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। যদি কোন খল লোক কোন সাধু ব্যক্তির উপর নানা সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ সাধু ব্যক্তির নিকট আমাদিগের

সন্দেহ জানাইয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করা উচিত। সেরূপ করিলে আমাদিগের সন্দেহ অমূলক কি না তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর সন্দেহ প্রকৃত হইলে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি তাদৃশ আচরণ হইতে বিরত হইতে পারেন। কিন্তু নীচ ও ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরা এরূপ সৎ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে না। যাহার উপরি তাহাদের একবার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহারা যাবজ্জীবন তাহার সহিত সাধুতাচরণ পরিত্যাগ করে।

২০শ—ন্যায়পরতা।

ন্যায়পরতা মনুষ্যের একটী প্রধান গুণ। যিনি ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করেন, তিনি যাবজ্জীবন সুখে কাল কাটাইতে পারেন। অন্যায় করিলে অন্যায় পাইতেও হয়। এইরূপে জগতের সমস্ত মনুষ্য যদি পরস্পর অন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে লোকসমাজ এককালে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অতএব ন্যায়পথে চলা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিবার স্থল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।—

প্রথমতঃ। যে দ্রব্যে যাহার অধিকার বা স্বত্ব থাকে, তাহার সেই দ্রব্য অপহরণ করা উচিত নহে। কারণ, যে ব্যক্তি অনেক পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জ্জন করে, তাহা তাহারই থাকা

উচিত, অন্য লোকে তাহা হরণ করিলে, অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করা হয়। এরূপ চৌর্য্যবৃত্তি সমাজে প্রবল হইলে, শ্রমজীবিগণের শ্রম করিতে প্রবৃত্তি থাকিবে না; সুতরাং আমাদিগের নানাবিষয়ে অভাব ঘটিবে, এবং সংসার অতি অসুখের স্থান হইয়া উঠিবে। অতএব পরদ্রব্য অপহরণ করা কাহারও উচিত নহে।

দ্বিতীয়তঃ। বিষয়কর্ম্ম করিতে হইলে আমাদিগকে কখন কখন অপরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। অধমর্ণ (অর্থাৎ যে ঋণ লয়) ঋণ গ্রহণ করিয়া যদি নিরূপিত সময়ে সেই ঋণ পরিশোধ না করে, তাহা হইলে অন্যায় কর্ম্ম করা হয়; উত্তমর্ণের (অর্থাৎ যে ঋণ দেয় তাহার) নিকট তাহাকে বিশ্বাসঘাতক ও তদীয় ধনের তস্করস্বরূপ হইতে হয়; এবং ভবিষ্যতে তাহার নিকট হইতে ঋণ প্রাপ্ত হইবার আশাও থাকে না। অগ্রে ঋণ পরিশোধের উপায় স্থির না করিয়া ঋণ গ্রহণ করাও অন্যায়। যে ব্যক্তি ঋণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, পরিশোধের কোন উপায় করে না, তাহাকে কখনই ন্যায়পরায়ণ বলা যাইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ। লোকসমাজে সুখ্যাতি লাভ করা সকলেরই অভীষ্ট। সুখ্যাতি লাভ করিতে লোকে প্রাণপর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে কাতর হয় না। যে নীচাশয় ব্যক্তি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া অপরের সুখ্যাতি লোপ করে, তাহাকে লোকে অন্যায়কারী কহিয়া থাকে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কখন কাহারও মিথ্যা অপবাদ দেন না। মিথ্যা দোষারোপ দ্বারা যশ হরণ করা আর দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন হরণ করা উভয়ই সমান গর্হিত

কার্য্য। নিন্দার কারণ থাকিলেও, কাহার কখনও নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে; বরং দোষ দেখিলে দোষীকে গোপনে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, যাহারা মহাত্মাদিগের নিন্দা করে, তাহারাই যে কেবল পাতকী তাহা নহে, যাহারা ঐ নিন্দা শ্রবণ করে, তাহারাও পাপী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ। আর একপ্রকার ন্যায়পরতা আছে, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। জগতে কেহ স্বামী, কেহ বা ভৃত্য; কেহ নিয়োগ্য, কেহ বা নিযুক্ত; এইরূপই হইয়া আসিতেছে। যখন কেহ কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে, তখন তাহার সেই কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। সম্যক্‌রূপে স্বামি-কার্য্য নির্ব্বাহ না করিলে স্বামীকে প্রতারণা করা হয়; এবং এইরূপ অসম্পূর্ণ কর্ম্ম করিয়া অর্থ লওয়া চুরি করিয়া লওয়ার সমান। অতএব যে যখন যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে, ধর্ম্মতঃ ও যত্নপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে তাহার ন্যায়পরতা প্রকাশ করা হয়। ভৃত্যের প্রভু-কার্য্যে অবহেলা করা অনুচিত; বিচারকের অপক্ষপাতে বিচার করা কর্ত্তব্য; কেহ কোন কার্য্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে সৎ পরামর্শ দেওয়াই বিধেয়। এইরূপ নানা বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া চলিলে, ন্যায়পরতা প্রকাশ করা হয়।

২১শ—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

যিনি যত দূর সাবধান হউন না কেন, জীবনের মধ্যে যে কখন বিপদে পড়িবেন না, এরূপ আশা করিতে পারেন না। অনেক বিপদ্ অকস্মাৎ ঘটিয়া থাকে। কোন কোনটী বা পূর্ব্বে জানিতে পারিলেও, তাহার প্রতীকার করা আমাদিগের অসাধ্য। বিপদ্, উপস্থিত হইলে কতকগুলি লোক ভয়ে এমনি হতবুদ্ধি হয়, যে তাহারা আত্মরক্ষার্থ কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না। কেহ কেহ বা বিপদ্ পড়িলে এরূপ ব্যাকুল ও ব্যতিব্যস্ত হয় যে, বিপদুদ্ধারের উপায় করা দূরে থাকুক, তাহারা আরও অধিকতর বিপদে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিপদ্ ঘটিলে অভিভূত বা ব্যাকুল না হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করাকেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কহে। এই গুণ সর্ব্বত্রই প্রশংসনীয়।

অধিক বুদ্ধি থাকিলেই যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকে, তাহাও বলা যায় না। বিপদ্-সময়ে কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তিও অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে, এবং অনেক বিজ্ঞ লোকও ভয়ে অভিভূত হইয়া যান। জগতে এরূপ কত-প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা যে, কোন্ বিপদে কোন্ উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা উপদেশ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। তবে কতকগুলি ভয়ঙ্কর বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় জানিয়া রাখা উচিত। ঐ সকলের মধ্যে অগ্নিসংযোগ, জলমজ্জন, দস্যু-হস্তে পতন, অত্যুচ্চ স্থানে উত্থান প্রভৃতি বিপদ্ প্রধান। কাহারও বস্ত্রে অগ্নি লাগিলে দ্রুতবেগে দৌড়াদৌড়ি না করিয়া

তৎক্ষণাৎ ভূতলে লুণ্ঠন বা সতরঞ্চ, গালিচা, কিংবা কম্বল দ্বারা গাত্র বেষ্টন করা কর্ত্তব্য। গৃহে অগ্নি লাগিয়া উহা ধূমে পরিপূর্ণ হইলে তন্মধ্য হইতে দণ্ডায়মানরূপে বহির্গত না হইয়া হামাগুড়ি দিয়া আসা কর্ত্তব্য। তৎকালে গৃহের তলভাগের উপরই নির্ম্মল বায়ুর সঞ্চার থাকে। হঠাৎ একাকী জলমগ্ন হইলে, যদি সন্তরণ জানা না থাকে, তবে হস্তপদাদি সঞ্চালন না করিয়া নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রাখাই বিধেয়, তাহা করিলে শরীর জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে। অনেকে একত্র দৈবাৎ জলমগ্ন হইলে, পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সেরূপ করিলে সকলেরই একবারে জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা। সে সময় অন্য কোন দ্রব্য অবলম্বন করাই বিধেয়। অকস্মাৎ দস্যুদলের হস্তে পতিত হইলে ভয়ে অভিভূত না হইয়া এমন কৌশল করা কর্ত্তব্য, যাহাতে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও জীবন রক্ষা করিতে পারা যায়। কেহ কোন অত্যুন্নত স্থানে উঠিয়া অন্যমনস্কতাবশতঃ ঐ স্থানের নিতান্ত শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি চকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইতে পারে। সে সময় এমন কোন উপায় করা উচিত, যাহাতে সে ব্যক্তি স্বয়ং ঐ উচ্চ স্থান হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে পারে। এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-প্রকাশের আরও অনেকপ্রকার স্থল দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার সকলগুলি নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

২২শ—বৈরনির্যাতন—ক্ষমা।

কেহ আমাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিলে, আমাদিগের অন্তঃকরণে তখনি তাহার প্রতিশোধ দিবার ইচ্ছা জন্মে, এবং সুযোগ পাইলে আমরা সেই ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়াও থাকি। ইহাকেই বৈরনির্যাতন কহে। বৈরনির্যাতন এক-প্রকার অযুক্তিসঙ্গত ন্যায়পরতা। অপরাধের প্রতিশোধ দেওয়া কতক পরিমাণে ন্যায্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু নির্যাতন কিছু বাড়া-বাড়ি হইলে আবার রাজদণ্ডের অধীন হইতে হয়। যে ব্যক্তি প্রথম কাহারও অনিষ্ট করে, সে রাজনিয়ম ভঙ্গ করে; পরে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং বৈরনির্যাতন করিলে, রাজনিয়মের অবহেলা করা হয়; কারণ, অপরাধীর দণ্ডবিধান রাজারই কর্ত্তব্য। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, অপরাধের প্রতিশোধ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।

আরও দেখ, অনিষ্টকারীর নির্যাতন করিলে, তাহার সম-কক্ষ হইতে হয়। আর তাহার অপরাধ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলে, তাহা অপেক্ষা উন্নত হওয়া যায়। ক্ষমা অতি প্রধান গুণ। যাঁহার ক্ষমাগুণ থাকে, তিনি দেবতুল্য মনুষ্য, সন্দেহ নাই। নির্যাতনের ক্ষমতা থাকিতেও অপ-রাধীকে ক্ষমা করা অতি উদার অন্তঃকরণের কার্য্য ও মানবজীবনের পরম গৌরবস্থল। যাহা একবার অতীত হয়, তাহা আর কখন ফিরিয়া পাওয়া যায় না; এজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের উপরই অধিক নির্ভর করেন। সুতরাং দৈববশতঃ যে অনিষ্ট বা ক্ষতি একবার

হইয়া যায়, যদি তাহা শুধরাইবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য বৈরনির্যাতন করা অনর্থক মাত্র; তাদৃশ নির্যাতনে সেই ক্ষতির কখন পুনরুদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে নির্যাতন করা অপেক্ষা ক্ষমা করাই বিজ্ঞের কর্ম্ম।

বৈরনির্যাতন দ্বিবিধ, সম নির্যাতন ও গুরুতর নির্যাতন। যেমন অপরাধ, ঠিক সেইরূপ নির্যাতন হইলে, সম নির্যাতন কহে। এতাদৃশ নির্যাতনে কোন বিশেষ ক্ষতি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যে স্থলে অপরাধের অপেক্ষা নির্যাতন গুরুতর হইয়া উঠে, তথায় সেরূপ নির্যাতন হেতু রাজদণ্ড সহ্য করিতে হয়। সুতরাং তাদৃশ নির্যাতনকারীর দুইটী শত্রু হইয়া উঠে, ১ম নির্যাতিত ব্যক্তি, ২য় রাজা। অতএব এরূপ নির্যাতন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে রাজদণ্ডাধীন হইতে না হয়। কিন্তু নির্যাতন-কালে এ বিষয় স্মরণ থাকে না। ক্রোধ হইলে লোকের বুদ্ধি-লোপ হইয়া যায়। এজন্য অনেক স্থলে নির্যাতন প্রায় গুরুতরই হইয়া পড়ে।

সাধুরা কহেন, অপরাধী ব্যক্তির অন্তঃকরণে অনুতাপ জন্মাইয়া দেওয়াই নির্যাতনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক স্থলে নির্যাতন অপেক্ষা ক্ষমাপ্রদর্শনেই এই উদ্দেশ্য অধিকপরিমাণে সাধিত হয়। কিন্তু নির্যাতন করিলে লোকের অন্তঃকরণে অনুতাপের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রোধেরই উদ্রেক হইয়া থাকে। ক্ষমা করিলে অপরাধীর হৃদয় আর্দ্র হয়, এবং সে স্বকীয় দোষ বুঝিতে পারে; কিন্তু নির্যাতন করিলে নির্যাতিত ব্যক্তির মনে ক্রোধ উদিত হইয়া তাহার জ্ঞান-লোপ

করে। জল স্থির হইলেই তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু উহা কোন কারণে চঞ্চল হইলে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না।

ক্ষমা-প্রদর্শন সর্ব্বত্রই বিধেয়; কিন্তু যে সকল অপরাধে লোকসমাজের প্রভুত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাদৃশ অপ-রাধের নির্যাতন অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল দুরাচার ব্যক্তির দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ উৎপীড়িত হইয়া উঠে, তাহাদিগের শাসন না করিয়া ক্ষমা করিলে, জগতের অপকারই করা হয়।

২৩শ—দারিদ্র্য।

সংসারে দারিদ্র্য অতীব দুঃখদায়ক পদার্থ। যতপ্রকার দুঃখ সংসারাশ্রমে ভোগ করিতে হয়, দারিদ্র্য-দুঃখ অপেক্ষা গুরুতর, বোধ হয়, আর কিছুই নাই। দরিদ্রের গৃহে প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুরই অভাব। অন্ন, বস্ত্র ও রোগাদির চিকিৎসা জন্য ঔষধ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সর্ব্বদা অভাব ঘটিলে, কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারা যায় না। বৃদ্ধ পিতা, মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গ যখন অন্নাভাবে কষ্ট পান, শিশু বালক বালিকারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যখন রোদন করিতে থাকে, তখন দরিদ্র ব্যক্তির অন্তঃকরণে যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। যখন প্রাণতুল্য শিশু সন্তান পীড়িত হইয়া চিকিৎসা ও পথ্যাদির অভাবে মারা যাইতেছে দেখিতে পায়, তখন

দরিদ্রের মনে যে কি ভয়ানক যাতনা জন্মে, তাহা কে বলিতে পারে ?

নীচবংশীয় দরিদ্র ব্যক্তির ত কথাই নাই; সে ত জগতে মনুষ্য বলিয়াই গণ্য নহে। যদি কোন ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি দারিদ্র্যদশায় পতিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরুপায় হইয়া কাহারও নিকট ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিতান্ত অপমান জ্ঞান হয়, এবং ক্রমে অতিশয় হীনতা ও লজ্জা জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বদা লজ্জিত থাকিতে হইলে বিন্দুমাত্র তেজস্বিতা থাকে না। নিস্তেজ ব্যক্তি জগতে সকলের নিকটেই পরাভব প্রাপ্ত হয়। অনবরত পরাভব হেতু তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর আত্মগ্লানি জন্মিতে থাকে। অবশেষে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। এইরূপে বুদ্ধি লোপ পাইলে তাঁহার আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। অতএব দারিদ্র্য সকল বিপদেরই কারণ, দুশ্চিন্তার উত্তেজক, আত্মপ্রসাদের পরম শত্রু, মিত্রবর্গের অবজ্ঞাস্থল এবং আত্মীয় স্বজনের বিদ্বেষের হেতু। এই সকল কারণে দরিদ্রের মনে সর্ব্বদা প্রবল যাতনা উৎপন্ন হয়, এবং উহাতে সে অনবরতই কষ্ট পাইতে থাকে।

এই সংসারে দরিদ্র ব্যক্তিকে কেহই আদর করে না; কেহ তাহার সহিত, একত্র বাস করা দূরে থাকুক, আলাপ করিতেও চাহে না; আত্মীয় অন্তরঙ্গগণ, পাছে তাহার দুঃখের কথা শুনিতে হয় এই ভয়ে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও ইচ্ছা করে না। দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া দয়া করেন, জগতে এরূপ অতি অল্প ব্যক্তিই দেখা যায়। ফলতঃ, দরিদ্রের পক্ষে

নিখিল ভূমণ্ডল কেবল অন্ধকারময়, কেবল দুঃখময়, ও কেবল নৈরাশ্যময় বোধ হইয়া থাকে।

দরিদ্র জনের অন্তঃকরণে কোন বিষয়ের অভিলাষ জন্মিলে, তাহা সফল হওয়া কঠিন; তাদৃশ অভিলাষ কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাসেই পরিণত হয়। দরিদ্র ব্যক্তির দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ সকল কোন কাজেই লাগে না। লোকসমাজে "লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগ্য" প্রভৃতি যে সকল গালি প্রচলিত আছে, দরিদ্র ব্যক্তিই তাহার লক্ষ্য। দরিদ্রের গৃহে অলক্ষ্মী দিবারাত্রি বিরাজমান, লক্ষ্মীশ্রী কখন তথায় আসিতে পারেন না।

মনুষ্যসমাজে দারিদ্র্য-নিবন্ধন যেরূপ হীনতা জন্মে, এরূপ আর কিছুতেই ঘটিতে পারে না। বস্তুতঃ, যে ব্যক্তির কিছুই নাই, কাহারও কোনরূপ উপকার করিবে এরূপ ক্ষমতা নাই, সামাজিক কোন সৎকার্য্যে যোগদান করিবার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, তাহার সামাজিক সম্মানের সম্ভাবনা কি? সে ব্যক্তি সকলের বিবেচনায় পৃথিবীর জঞ্জালস্বরূপ হইয়া থাকে। লোকে তাহাকে উৎপাত ও অমঙ্গলজনক জ্ঞান করে। অতএব দারিদ্র্য অপেক্ষা মরণ সহস্রাংশে ভাল; কারণ, মরণে একবার-মাত্র ক্লেশ; দারিদ্র্যদশায় চিরকাল দুঃখ।

২৪শ—ধন-সম্পত্তি।

ধন-সম্পত্তি সংসারে পরম সুখকর বস্তু। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া অল্প সৌভাগ্যের ফল নহে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গেলে যতপ্রকার সামগ্রীর আবশ্যক, ধন-সম্পত্তিকে তাহার প্রথম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। লোকসমাজের প্রয়োজনীয় সমুদয় কার্য্যই ধন দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। ধনবান্ ব্যক্তি যাহা মনে করেন, যে কোন মহৎ কার্য্য করিতে অভিলাষ করেন, সে সমস্তই অনায়াসে সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন। পৃথিবীর যাবতীয় শোভা, যাবতীয় সুখ, ও যাবতীয় সুবিধা—সকলই ধন-সাধ্য। সুরম্য হর্ম্ম্যতল, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ, মনোরম উপবন, সুমিষ্ট পান-ভোজন, পরমরমণীয় যান-বাহন, এবং ইন্দ্রিয়ের সুখজনক বহুবিধ বিলাসের সামগ্রী সকল ধন-সম্পত্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে।

জগতে যাহার ধন আছে সেই ধন্য, সেই মান্য, এবং সেই সর্ব্বাগ্রগণ্য। "বড় মানুষ" বলিলে ধনবান্ ব্যক্তিকেই বুঝায়। বিন্দুমাত্র গুণ না থাকিলেও, কেবল ধন থাকাতেই লোকে প্রশংসনীয় ও গৌরবান্বিত হইয়া থাকে। সকল লোকই ধনশালী ব্যক্তির বাধ্য, সকল লোকই তাঁহার আয়ত্ত, এবং সকল লোকই তাঁহার আনুগত্য করিতে প্রয়াস পায়।

দয়ালু, বদান্য ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন, তাহা হইলে তিনি জগতে যে কতপ্রকার মঙ্গলকর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন তাহার সঙ্খ্যা নাই। কত দীন দুঃখী

জনের দুঃখ মোচন করেন, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কত অনাথ বালক বালিকাদিগকে বিদ্যা দান করেন, ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কত শত দরিদ্র রোগীর রোগ শান্তি করেন, জলশূন্য দেশে পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি খনন করিয়া কত লোকের জীবন রক্ষা করেন, অতিথিশালা প্রভৃতি স্থাপিত করিয়া কত লোককে প্রতিপালন করেন, এবং কত শত বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ্ নিবারণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ধন দ্বারা যে সকল হিতকর ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, ধার্ম্মিক ধনবান্ ব্যক্তি সেই সমস্তই করিয়া থাকেন। আর, নির্দ্দয়, কৃপণ ও অধার্ম্মিকের হস্তে ধন-সম্পত্তি পতিত হইলে, উহা দ্বারা কোন সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বহুতর অনিষ্টজনক ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। কৃপণের ধন ত ধন বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না, উহা আরাধ্য জড় পদার্থ মাত্র। কারণ, যে ধন সৎকর্ম্মে ব্যয়িত না হয়, সে ধন ধনই নহে।

ধন প্রধানতঃ দুই প্রকার, পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত। স্বোপার্জ্জিতও আবার দুইপ্রকার,—১ম, শ্রম-বাণিজ্যাদি দ্বারা ন্যায়-পথে উপার্জ্জিত, এবং ২য়, চৌর্য্য, প্রতারণা প্রভৃতি দ্বারা অন্যায়পথে উপার্জ্জিত। যাঁহারা ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়া ধনী লোকের পোষ্যপুত্র-রূপে গৃহীত হন, তাঁহারাই পৈতৃক ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাহা অধিক লোকের ভাগ্যে ঘটে না। অধিকাংশ লোককেই নিজ পরিশ্রমে ধন উপার্জ্জন করিতে হয়। যে সকল সচ্চরিত্র সন্তান পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৎকার্য্য দ্বারা ঐ ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া

থাকেন। আর অসচ্চরিত্র সন্তানের হস্তে পৈতৃক ধন পতিত হইলে, কেবল অসৎ কার্য্যেই উহা ব্যয়িত হয়, এবং শেষে একবারে নিঃশেষ হইয়া যায়;—পৃথিবীতে অধিকাংশ ধনী লোকের ধনরাশির এইপ্রকারই পরিণাম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল সাধু মহাত্মা নিজ পরিশ্রমে ন্যায়পথে উপার্জিত ধন দ্বারা জগতের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন ও অমঙ্গল নিবারণ করেন, তাঁহারাই যশস্বী ও প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

চৌর্য্যাদিরূপ অন্যায় উপায়ে ধন উপার্জ্জন করা অতীব অকর্ত্তব্য। তাহাতে অনেকের অনিষ্ট করা হয় বলিয়া অত্যন্ত নিন্দাভাজন হইতে হয়, এবং পরিণামেও নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়া বিস্তর কষ্ট পাইতে হয়। যদিও দৈবাৎ কোন অধার্ম্মিক ধনী ব্যক্তির কোন বিপদ্ ঘটনা দেখিতে না পাওয়া যায়, তথাপি "অন্যায় করিয়া কত লোককে কত কষ্ট দিয়াছি, আমা দ্বারা অনেক অকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অনেকে আমাকে অধার্ম্মিক মনে করিয়া থাকে" এইপ্রকার ভাব সকল মনে উদিত হওয়াতে, তাহাকে যাবজ্জীবন অনুতাপ ভোগ করিতে হয়। চৌর্য্যাদি দ্বারা ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া নিরুদ্বেগে ও স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে অতি অল্প লোককেই দেখিতে পাওয়া যায়।

২৫শ—যশোলিপ্সা।

যশ অতি অমূল্য ধন। এই ধন উপার্জ্জন করিবার জন্য জগতের যাবতীয় লোক উন্মত্ত। যশের ইচ্ছা করে না এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল। কীর্ত্তিদেবীর উপাসক অনেক, কিন্তু প্রকৃত অনুগৃহীত ব্যক্তি অতি অল্প। কীর্ত্তি মানব-চিত্তের মরীচিকা। এই বস্তুর জন্য কত শত লোক জীবন-পথে ধাবমান হইয়া শেষে নিরাশ-মানসে মানব লীলা সংবরণ করিতেছে। কেহ যৎকিঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে। কেহ বা সম্যক্ ফলভোগী হইয়াও সন্তোষ লাভ করিতেছে না।

যশোলিপ্সার শেষ নাই। যশের যতই আকাঙ্ক্ষা করা যায়, যশোলিপ্সা ক্রমশঃ ততই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যশোহীন ব্যক্তি অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির যশোলালসা যে এত অধিক, ইহাই তাহার কারণ। যশ উপার্জ্জন করা যাদৃশ কঠিন কার্য্য, যশ রক্ষা করাও তদপেক্ষা সুকঠিন। পদ্মপত্রের উপরিস্থিত জলবিন্দুর ন্যায়, কীর্ত্তি নিতান্ত চঞ্চল। বহুদিনে উপার্জ্জিত কীর্ত্তি এক মুহূর্ত্তের দোষেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। যিনি যাবজ্জীবন যশস্বী থাকিয়া নির্দোষে জীবিতকাল অতি-বাহিত করিতে পারেন, জগতে তিনিই ধন্য।

ব্যক্তিমাত্রেরই যশোলিপ্সা থাকা আবশ্যক; কিন্তু ঐ অভিলাষ অতিরিক্ত হওয়া অনুচিত। শুদ্ধ যশোলাভের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ক্ষয় করা মূর্খের কর্ম্ম। অবশ্য-সম্পাদনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সকল অবহেলা করিয়া কেবল কীর্ত্তিলাভের চেষ্টা করাও অধার্ম্মি-কের আচরণ। পরিবারবর্গকে কষ্ট দিয়া পরের উপকারার্থ

অর্থব্যয় করাও অবিবেচকের কার্য্য। তাদৃশ ব্যক্তি লোক-সমাজে যশস্বী বলিয়া খ্যাত হইতে পারেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবিজ্ঞ (আহাম্মক) ও অদূরদর্শী নামেরও ভাগী হইয়া থাকেন। কিন্তু যিনি মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্ম-পথে কীর্ত্তি লাভ করিয়া যান, তিনি চিরকাল জগতে জীবিত থাকেন। এইজন্য "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" অর্থাৎ যাহার কীর্ত্তি থাকে, সে চিরকাল জীবিত থাকে, এই প্রবাদটী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

২৬শ—আত্মপ্রসাদ—আত্মগ্লানি

অন্তঃকরণের প্রফুল্লতার নাম আত্মপ্রসাদ আর বিষণ্ণভাবের নাম আত্মগ্লানি। আত্মপ্রসাদ অতি বাঞ্ছনীয় পদার্থ। যাঁহার আত্মপ্রসাদ আছে, তিনি পরম সুখী; তাঁহার আকার অত্যন্ত রমণীয়, মুখমণ্ডল সদা প্রসন্ন ও সহাস্য, কাহারও সহিত আলাপ করিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে কেবল মধুর বাক্য বহির্গত হইতে থাকে। তাঁহার প্রকৃতি অতিশান্ত ও সরল, নিষ্ঠুরাচরণ করিতে কিছুতেই তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু আত্মগ্লানি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহার আত্মগ্লানি জন্মিয়াছে, তাহার নিরন্তর দুঃখ; তাহার মুখ সতত ম্লান ও বিবর্ণ, কথা কহিবার সময় হঠাৎ কটু ও কর্কশ বাক্য নির্গত হইয়া পড়ে,

নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রায় পদে পদেই ঘটিয়া উঠে। ফলতঃ আত্মপ্রসাদ স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট নিধি, আর আত্মগ্লানি নরকের নিকৃষ্ট পদার্থ।

আত্মপ্রসাদ দুইপ্রকার, ক্ষণিক ও ধারাবাহিক। যখন কোন সুখজনক ঘটনা উপস্থিত হয়, অথবা কোন সৌভাগ্য-লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎকালে ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ হওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু সংসার-সাগরে যেরূপ অবিরত দুঃখ-তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, ইহাতে ধারাবাহিক আত্ম-প্রসাদ নিতান্ত অসম্ভব; বরং আত্মগ্লানিই সর্ব্বদা সকলের স্থায়ী হয় বলিতে পারা যায়। দীন দুঃখীর ত কথাই নাই, সৌভাগ্য-বান্ লোকেরও রোগ, শোক ও বিপদাদি কারণে প্রতিনিয়তই আত্মগ্লানি দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ জগতে আত্মগ্লানি অতিসুলভ পদার্থ, আত্মপ্রসাদ অতীব দুর্লভ।

যে সকল মহাত্মা অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী, অতীব সহিষ্ণু, উপেক্ষা করিতে বিলক্ষণ সমর্থ; অতিশয় দুঃখ ও ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত হইলেও যাঁহাদের মন বিচলিত হয় না; জগতের অনিত্যতা নিত্যই যাঁহাদের চিত্তে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; "কোন কার্য্যই আমাদের আয়ত্ত নয়, কোন ঘটনাই আমাদের ইচ্ছানুসারে ঘটিতে পারে না, সকল ব্যাপারই জগদীশ্বরের নিয়মানুসারে চলিতেছে; কখন্ যে কি হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা মনুষ্যের সাধ্য নহে, অতএব সুখ বা দুঃখের বিষয় উপস্থিত হইলে নিতান্ত উন্মত্ত হওয়া অতীব অকর্ত্তব্য;" ইত্যাদি বিবেচনা যে সকল মহাত্মার মনে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারাই কথঞ্চিৎ ধারাবাহিক আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু

এরূপ মহাত্মা,—এপ্রকার সারবান্—ও এবংবিধ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জগতে অতি বিরল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

২৭শ—সঙ্গীত।

জগতে যতগুলি রমণীয় ও মনোমোহন বস্তু আছে, সঙ্গীত তন্মধ্যে একটী প্রধান। সঙ্গীতের প্রভাবে কি পশু, কি পক্ষী, কি মনুষ্য, সকলপ্রকার জীবই সহসা মোহিত হইয়া থাকে। সঙ্গীত দরিদ্রকে জীবিকা দান করে, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করে, ধনবানের সুখে কাল কাটাইবার বস্তু হয়, এবং কবিগণের পরম প্রিয় সামগ্রী হইয়া থাকে। সঙ্গীতের অদ্ভুত শক্তি। ইহা পাষাণহৃদয়কেও দ্রব করিয়া থাকে। সঙ্গীত অন্তঃকরণের গ্রন্থি সকল শিথিল করিয়া দেয়, মর্ম্মস্থান স্পর্শ করে, এবং অন্তঃকরণে অমৃতধারা বর্ষণ করে। ইহা কখন আমাদিগকে অনন্ত আনন্দ-সাগরে ভাসমান করে, কখন গভীর শোক-কূপে নিক্ষেপ করে, কখন প্রবল রোষানলে প্রজ্বলিত করে, কখন বা হর্ষ-বিষাদের সম্মিলন-জাত এক অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ করে।

পথিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আমাদিগের অন্তরাত্মা যখন সাংসারিক ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সুকোমল সঙ্গীত আমাদিগের শ্রবণবিবরে কিরূপ আনন্দজনক বোধ হয় তাহা বর্ণনাতীত। এইজন্যই অনেকে রজনীর

প্রথম ভাগ সঙ্গীতের আলোচনাতেই অতিবাহিত করেন। অতিগভীর নিশীথে দূর হইতে সমাগত সঙ্গীতস্বর কাহার না মনোহরণ করে? সঙ্গীত উভয় পক্ষেরই প্রীতিদায়ক। ইহাতে শ্রোতৃগণের অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত উচ্ছলিত হয়; এবং তাহাদিগের মুখনির্গত প্রশংসাবচন ও নয়নে প্রকাশমান হর্ষচিহ্ন সকল গায়কদিগকে আহ্লাদে পরিপূর্ণ ও অধিকতর উৎসাহযুক্ত করিয়া তুলে। এই কারণেই পুরাণ শাস্ত্রের কথক সুগায়ক হইলে সমধিক প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন।

সঙ্গীতশক্তি একটী মহৎ গুণ। সঙ্গীত-রসজ্ঞ ব্যক্তি অনেক, কিন্তু সঙ্গীতক্ষম ব্যক্তি অতি অল্প। সঙ্গীত করিবার ইচ্ছা প্রায় সকলেরই আছে, এবং অনেকে নির্জ্জনে যথাশক্তি উহা করিয়াও থাকেন; কিন্তু সুন্দর সঙ্গীত করিবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। একজন সদ্‌বক্তা যেরূপ অনেকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন, একজন সুমধুর গায়কও তদ্রূপ সাধারণের মনোহরণ করিতে সমর্থ হন; বরং সদ্‌বক্তার অপেক্ষা সদ্‌গায়ক সমধিক প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। কারণ, বক্তা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশক্তি পরিচালিত করিয়া থাকেন, কিন্তু গায়ক আমাদিগের মনোবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি উত্তেজিত করিয়া দেন। যুক্তিপরিচালন অপেক্ষা কল্পনার উত্তেজন করা অধিকতর সহজ কার্য্য। এইনিমিত্তই বক্তৃতাস্থল অপেক্ষা সঙ্গীতস্থলে অধিক লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধ ব্যক্তিগণের সঙ্গীতশক্তি স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। অপরের দয়া ব্যতীত তাহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহ করা কঠিন; আর, হৃদয় আর্দ্র করাও সঙ্গীতের একটী প্রধান কার্য্য। বোধ

করি, তজ্জন্যই জগদীশ্বর অন্ধদিগকে সঙ্গীতক্ষম করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সঙ্গীত করিতে হইলে মধুর স্বর প্রয়োজনীয়। কর্কশ-স্বরে সঙ্গীত করা গর্দ্দভধ্বনির তুল্য বিরক্তিকর; সুতরাং যাহাদিগের স্বাভাবিক মধুর স্বর থাকে, তাহারাই সঙ্গীতদ্বারা লোকের মন হরণ করিতে পারে।

নির্দোষ সঙ্গীতচর্চ্চাই লোকসমাজে প্রশংসনীয়। কিন্তু অনেক স্থলে কুসংসর্গদোষে সঙ্গীতালোচনা নানা কুপ্রবৃত্তিতে দূষিত দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য অনেকে সঙ্গীত বিদ্যা-কেই দূষণীয় ও ঘৃণার্হ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু পরিশুদ্ধ আমোদের নিমিত্ত সঙ্গীত কখনই দূষণীয় নহে। সঙ্গীত বেদ-চতুষ্টয়ের সার বস্তু: সামবেদ সমস্তই সঙ্গীতময়। সঙ্গীত বাল্মীকি, হোমর প্রভৃতি কবিগণের পরম আদরের ধন। সঙ্গীত নাটকাদি গ্রন্থের প্রধান উপকরণ। প্রকৃতির গায়কা পক্ষিদিগের নিকট হইতে আমরা সর্ব্বাগ্রে সঙ্গীতের শিক্ষা পাই। সুতরাং সঙ্গীত কখনই ঘৃণার্হ বস্তু হইতে পারে না। আমাদিগের দোষেই সঙ্গীত-চর্চ্চায় দোষ ঘটিয়া থাকে।

রচনার বিষয়

(শিক্ষক মহাশয়গণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে এক এক করিয়া ছাত্রদিগকে লিখিতে দিবেন।)

১। বস্তুবিষয়ক রচনা।

১। বস্ত্র—কার্পাস—ঊর্ণা কি?

২। মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা।

৩। লাক্ষা কি পদার্থ?

৪। পাথুরিয়া কয়লা কিরূপে জন্মে ও তাহার কি কি উপকার?

৫। কৃষ্ণ, লোহিত, ও হরিদ্বর্ণ মসী কিরূপে প্রস্তুত হয়? মুদ্রাযন্ত্রের মসীর উপকরণ কি?

৬। তৈল কতপ্রকার আছে বল।

৭। আল্‌কাতরা কি পদার্থ?

৮। দস্তা ও টিনের বিষয় বর্ণন কর।

৯। দারুচিনি ও কাবাবচিনি।

১০। পারদের আকৃতি, প্রকৃতি ও উপকৃতি বর্ণন কর।

১১। পিণ্ডখর্জুর কিরূপে হয়?

১২। ব্যোম-যান কি? এবং কি প্রকারে ঊর্দ্ধে উঠে?

১৩। তাপমান ও বায়ুমান যন্ত্রের বিবরণ লিখ।

১৪। দুগ্ধে জল আছে কি না জানিবার জন্য পয়োমান-নামক একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহার আকার ও প্রকার লিখ।

১৫। দিগ্দর্শন যন্ত্রের উপকরণ উপকার লিখ।

১৬। তাড়িত বার্ত্তাবহ ও তাড়িত শব্দবহের প্রক্রিয়া বর্ণন কর।

১৭। কোন্ কোন্ যন্ত্র দ্বারা দূরস্থিত অথবা অতি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়? তাহাদের বিষয় লিখ।

১৮। গঙ্গার পোল বর্ণন কর।

১৯। রেলের গাড়ী বর্ণন কর।

২০। চন্দ্র ও সূর্য্য বর্ণন কর।

২১। সমুদ্র বর্ণন কর।

২২। পর্ব্বত বর্ণন কর।

২৩। শরৎকালীন ক্ষেত্র বর্ণন কর।

২। প্রাণিবিষয়ক রচনা।

১। কস্তুরিকা-মৃগ বর্ণন কর।

২। বন্য ও পোষিত শূকরের প্রকৃতির প্রভেদ বর্ণন কর।

৩। অশ্ব ও জিব্রার প্রভেদ লিখ।

৪। জিরাফ কিপ্রকার জন্তু?

৫। মাংসাশী জন্তুদিগের সাধারণ আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণন কর।

৬। কতপ্রকার বাংসাশী জন্তু আমাদিগের গৃহপালিত ?
৭। ভল্লুকের বিষয় বর্ণন কর।
৮। হস্তী ও জলহস্তীর আকৃতি লিখ।
৯। গণ্ডারের বিষয় বর্ণন কর।
১০। বানর, বনমানুষ ও নরের আকার বর্ণন করিয়া বুদ্ধিমত্তার তারতম্য স্থির কর। এতদ্বিষয়ে ডারুয়িন সাহেবের যেরূপ মত তাহা বর্ণন কর।
১১। মৎস্য বর্ণন কর. এবং মৎস্যের উদরে কি জন্য পট্‌কা থাকে তাহা লিখ।
১২। হাড়গিলা পক্ষী বর্ণন কর।
১৩। যে যে পক্ষী মনুষ্যের ভাষার কতক অনুকৃতি করিতে পারে, তাহাদের আকৃতি বর্ণন কর।
১৪। কতকগুলি জলচর পক্ষীর নাম কর; তাহাদের আকারগত বিভিন্নতা বর্ণন কর।
১৫। বিষধর সর্প বর্ণন কর।
১৬। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সর্প কোথা দেখা যায়? এবং কি কি?
১৭। আমাদিগের দেশে কতপ্রকার নির্বিষ ও সবিষ সর্প আছে, তাহাদের গুণ নির্দ্দেশ কর।
১৮। শল্লাকুর বিষয় যাহা জান তাহা বর্ণন কর।
১৯। ইন্দুরের বিষয় বর্ণন কর।
২০। কুম্ভীরের আকৃতি ও প্রকৃতি লিখ।
২১। ভ্রমরের বিষয় বর্ণন কর।
২২। জোনাকী পোকার আকার বর্ণন কর।
২৩। যে কীট হইতে আমাদিগের নানা বিলাস-বসন প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ বর্ণন কর।
২৪। কোন্ কীট হইতে প্রকাণ্ড দ্বীপ নির্ম্মিত হয়, তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখ।

৩। উদ্ভিদ্‌বিষয়ক রচনা।

১। কাঁটাল বৃক্ষ বর্ণন কর।
২। দ্রাক্ষার বিষয় যাহা জান তাহা লিখ।
৩। দাড়িম্ব বর্ণন কর।
৪। শাল বৃক্ষ বর্ণন কর।
৫। গোধূম বর্ণন কর।
৬। যতপ্রকার কপি জান, লিখ।
৭। তেঁতুল গাছের বিষয় লিখ।
৮। কলমী শাক বর্ণন কর।

৪। কালবিষয়ক রচনা।

১। গ্রীষ্মকাল বর্ণন কর।
২। বর্ষাকালের বিবরণ লিখ।
৩। শরৎকালের শোভা বর্ণন কর।
৪। হেমন্ত কালের বিবরণ যত দূর জান লিখ।
৫। শীতকালের বিস্তৃত বৃত্তান্ত বর্ণন কর।
৬। বসন্তকালের যাহা কিছু জান তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ কর।
৭। হিন্দুদিগের পূর্ব্বতন ও আধুনিক অবস্থা যত দূর জান লিখ।

৬। কতপ্রকার বাংলাদী জন্তু আমাদিগের গৃহপালিত?
৭। ভল্লুকের বিষয় বর্ণন কর।
৮। হস্তী ও জলহস্তীর আকৃতি লিখ।
৯। গণ্ডারের বিষয় বর্ণন কর।
১০। বানর, বনমানুষ ও নরের আকার বর্ণন করিয়া বুদ্ধিমত্তার তারতম্য স্থির কর। এতদ্বিষয়ে ডারুয়িন সাহেবের যেরূপ মত তাহা বর্ণন কর।
১১। মৎস্য বর্ণন কর. এবং মৎস্যের উদরে কি জন্য পট্‌কা থাকে তাহা লিখ।
১২। ফাড়িঙ্গা পক্ষী বর্ণন কর।
১৩। যে যে পক্ষী মনুষ্যের ভাষার কতক অনুকৃতি করিতে পারে, তাহাদের আকৃতি বর্ণন কর।
১৪। কতকগুলি জলচর পক্ষীর নাম কর; তাহাদের আকারগত বিভিন্নতা বর্ণন কর।
১৫। বিষধর সর্প বর্ণন কর।
১৬। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সর্প কোথা দেখা যায়? এবং কি কি?
১৭। আমাদিগের দেশে কতপ্রকার নির্বিষ ও সবিষ সর্প আছে, তাহাদের গুণ নির্দ্দেশ কর।
১৮। শজারুর বিষয় যাহা জান তাহা বর্ণন কর।
১৯। ইন্দুরের বিষয় বর্ণন কর।
২০। কুম্ভীরের আকৃতি ও প্রকৃতি লিখ।
২১। ভ্রমরের বিষয় বর্ণন কর।
২২। জোনাকী পোকার আকার বর্ণন কর।
২৩। যে কীট হইতে আমাদিগের নানা বিলাস-বসন প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ বর্ণন কর।
২৪। কোন্ কীট হইতে প্রকাণ্ড দ্বীপ নির্ম্মিত হয়, তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখ।

৩। উদ্ভিদ্‌বিষয়ক রচনা।

১। কাঁটাল বৃক্ষ বর্ণন কর।
২। দ্রাক্ষার বিষয় যাহা জান তাহা লিখ।
৩। দাড়িম্ব বর্ণন কর।
৪। শাল বৃক্ষ বর্ণন কর।
৫। গোধূম বর্ণন কর।
৬। যতপ্রকার কপি জান, লিখ।
৭। তেঁতুল গাছের বিষয় লিখ।
৮। কলমী শাক বর্ণন কর।

৪। কালবিষয়ক রচনা।

১। গ্রীষ্মকাল বর্ণন কর।
২। বর্ষাকালের বিবরণ লিখ।
৩। শরৎকালের শোভা বর্ণন কর।
৪। হেমন্ত কালের বিবরণ যত দূর জান লিখ।
৫। শীতকালের বিস্তৃত বৃত্তান্ত বর্ণন কর।
৬। বসন্তকালের যাহা কিছু জান তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ কর।
৭। হিন্দুদিগের পূর্ব্বতন ও আধুনিক অবস্থা যত দূর জান লিখ।

৮। কি কি কারণে পূর্ব্ব কালের হিন্দু রাজাদিগের তত দূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া লিখ।
৯। এক্ষণকার হিন্দুদিগের হীনাবস্থার কারণ নির্দ্দেশ কর।
১০। কালের মহিমা বর্ণন কর।
১১। ইতিহাস-পাঠের উপকারিতা কি?
১২। জগতের প্রকৃত হিতৈষী মহাত্মাদিগের নাম লিখিয়া তন্মধ্যে যে কোন ব্যক্তির জীবন-চরিত লিখ।
১৩। রামচন্দ্রের শাসনকাল বর্ণন কর।
১৪। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল যত দূর জান লিখ, এবং তৎকালীন উন্নতি বর্ণন কর।
১৫। বল্লাল সেন ভূপতির শাসনকাল বর্ণন কর।
১৬। যুধিষ্ঠির, আকবর, ও ভিক্টোরিয়ার শাসনরীতি পরস্পর-তুলনা কর।

৫। গুণ ও ক্রিয়া বিষয়ক রচনা।

১। অহঙ্কার করা অকর্ত্তব্য।
২। ক্রোধের দোষ গুণ লিখ।
৩। দুরাকাঙ্ক্ষার কি দোষ?
৪। স্বভাব ঘুচিবার নহে।
৫। শঠতা করা অনুচিত।
৬। অবিমৃষ্যকারিতার দোষ।
৭। কিরূপ রাজ্যশাসন করিলে রাজা যশস্বী হন?
৮। দলাদলি অতি কদর্য্য।
৯। কুসংস্কারের ফল কি?
১০। বাল্যবিবাহ প্রথা ভাল কি না?
১১। বহুবিবাহে ক্ষতি কি?
১২। অধ্যবসায়ের গুণ কি?
১৩। জ্ঞানী ও মূর্খের প্রভেদ।
১৪। কুসংসর্গ কর্ত্তব্য নহে।
১৫। সৎসংসর্গ কর্ত্তব্য।
১৬। লোভ প্রভৃতি রিপুদমন কর্ত্তব্য।
১৭। ভদ্রতার গুণাগুণ লিখ।
১৮। দেশ-ভ্রমণের ফল কি?
১৯। কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়?
২০। কিরূপ বক্তৃতায় উপকারের সম্ভাবনা?
২১। মাদক সেবন অকর্ত্তব্য।
২২। অন্যায় তোষামোদ।
২৩। মিথ্যাবাদিতা।
২৪। সমাজের সম্মান।
২৫। সামাজিক সভা।
২৬। শিক্ষককে সম্মান করা।
২৭। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান।
২৮। রাজবিদ্রোহ।
২৯। রাজভক্তি।
৩০। বিজ্ঞতার ফল কি?
৩১। পিতা মাতা ও সন্ততি।
৩২। প্রভুভক্তি।
৩৩। দয়া।
৩৪। ক্ষমা।
৩৫। সন্তোষ।
৩৬। স্বদেশের হিতচিন্তা।
৩৭। প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার।
৩৮। জন্মভূমি।
৩৯। জীবদিগের প্রতি ব্যবহার।
৪০। পরিবার-বর্গের প্রতি ব্যবহার।

৪১। সম্ভ্রান্ত ও ইতর লোকের প্রতি ব্যবহার।
৪২। স্বাবলম্বন।
৪৩। পরিমিতাহার কর্ত্তব্য।
৪৪। মিতব্যয়িতার ফল কি ?
৪৫। প্রতিজ্ঞা-পালন অবশ্য কর্ত্তব্য।
৪৬। মহানুভাবতা।
৪৭। গুরুজনের সম্মান।
৪৮। স্থিরচিত্ততার গুণ।
৪৯। দ্রব্যের অপচয় উচিত নহে।
৫০। আশুবিশ্বাস সর্ব্বনাশের মূল।
৫১। বাহ্য ও আন্তরিক সৌন্দর্য্যের প্রভেদ কি ? কোন্‌টী অধিক আদরণীয় ?
৫২। চৌর্য্যের দোষ লিখ।
৫৩। ধৈর্য্য অতি মহৎ গুণ।
৫৪। 'বড় লোক' ও 'বড় মানুষ' এই দুয়ের প্রভেদ কি ?
৫৫। জগতে কে সুখী ?
৫৬। উপচিকীর্ষা।
৫৭। দানের ফল কি ?
৫৮। অতিরিক্ত দানের ফল।
৫৯। একতার ফল কি ?
৬০। বাণিজ্যের উপকারিতা।
৬১। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।
৬২। ধর্ম্মজ্ঞান থাকা উচিত।
৬৩। স্বাধীনতা।
৬৪। বড় বাড়াবাড়ি ভাল নহে।
৬৫। গুণীর গুণ গুণীই বুঝে।
৬৬। অভ্যুদয়েও নম্র হওয়া উচিত।
৬৭। চিন্তায় দেহক্ষয়।
৬৮। আত্মীয়-বিরহ।
৬৯। মূর্খপুত্র হইতে কষ্ট।
৭০। পরের দোষ সকলেই দেখে, কিন্তু নিজের বেলা অন্ধ।
৭১। বিনীতব্যবহারের অভ্যাস ও তাহার ফল।
৭২। পরনিন্দা ও আত্মশ্লাঘা।
৭৩। পাপী ও পুণ্যাত্মার জীবন।
৭৪। সংসার-কারাগার।
৭৫। নাস্তিকতার ফল।
৭৬। প্রার্থনার উপকারিতা।
৭৭। স্বধর্ম্মপ্রতিপালন।
৭৮। ঈশ্বরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা।
৭৯। পরোপকার।
৮০। সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ফল।